অগ্নিবাণ

মাসুদ রানার প্রতিশোধ কী ভয়াবহ হতে পারে, এটা তারই কাহিনী। মধ্যপ্রাচ্যে বিসিআই-এর একজন ভ্রাম্যমাণ এজেন্ট নিখোঁজ। এডেনে রানা এজেন্সির দু'জন অপারেটর খুন। এরপর আর বসে থাকা যায় না। রানা সিদ্ধান্ত নিল ইসরায়েলের ন্যাভাল বেস সোকোট্রা দ্বীপ উড়িয়ে দেবে। শুরু হলো রুদ্ধশ্বাস অভিযান।

অগ্নিবাণ

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

এক

'আগুন নিয়ে খেলো না, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! শেষবার নিষেধ করছি, আমাদের কাজে নাক গলিয়ো না।'

ফ্যাক্স মেশিন থেকে মেসেজটা বেরিয়ে আসার আগেই পড়ে ফেলল রূপক মির্জা, চেহারায় কঠিন একটা ভাব ফুটল। গত তিন দিন ধরে এই একই ফ্যাক্স বারবার আসছে, প্রেরকের নাম-ঠিকানা ছাড়াই। টেলিফোনেও হুমকি দেয়া হচ্ছে, 'বেশি বাড় বেড়ো না, শোভন চৌধুরীর মত তোমাদেরও জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব।' পরিচয় না দিলেও, মির্জা জানে কারা তাকে ভয় দেখাচ্ছে। তবে এই শোভন চৌধুরীর উল্লেখ তার কাছে একটা রহস্য। এই নামে কাউকে সে চেনে না।

ইয়েমেন। রানা এজেন্সির এডেন শাখা।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটার পরও বেশ কিছুদিন এডেনে রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটি ছিল। অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ায় এডেন সহ আরও কয়েকটা সামরিক ঘাঁটি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয় মস্কো। এই সুযোগটাই কাজে লাগায় ওয়াশিংটন, রাশিয়াকে তারা প্রস্তাব দেয় সমস্ত ফ্যাসিলিটি সহ ঘাঁটিগুলো তারা কিনে নিতে চায়। যে জিনিস আবর্জনার মত ফেলে যেতে হবে, তার বিনিময়ে মোটা টাকা পাওয়া যাবে শুনে ক্রেমলিনের বড়কর্তা ইয়েলিৎসিন রীতিমত উল্লাস অনুভব করেন। সেদিন এক অনুষ্ঠানে জনসমক্ষে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার অবস্থা হয় তাঁর–ঘনিষ্ঠজনদের অনেকেই ধরতে পারেননি তিনি যে প্রায়ই অসুস্থজনিত কারণে হোঁচট খাবার উপক্রম করেন, এটা তারই ধারাবাহিকতা ছিল, উল্লাস অনুভব করার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না।

সে যাই হোক, এডেন থেকে রাশিয়ানরা চলে যাবার পর রানা এজেন্সি এখানে তাদের শাখা খোলার অনুমতি পেল। রাশিয়া অসন্তুষ্ট হতে পারে ভেবে এর আগে ইয়েমেন সরকার অনুমতি দিতে রাজি হয়নি। শাখাটা খোলা হয়েছে মাস ছয়েক আগে। শুরু থেকেই রূপক মির্জা একজন মাত্র সহকারীকে নিয়ে কাজ করছে এখানে। ইতিমধ্যে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেছে ইয়েমেনে। শুধু এডেন ঘাঁটি নয়, ইয়েমেনের একটা দ্বীপ সোকোট্রা-ও লীজ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ওই দ্বীপেও রাশিয়ানদের সামরিক ঘাঁটি ছিল। যুক্তরাষ্ট্র শুধু ওদের ফ্যাসিলিটি কিনেছে, জমি ও দ্বীপ লীজ নিতে হয়েছে ইয়েমেন সরকারের কাছ থেকে।

রাশিয়ানরা ঘাঁটি ছেড়ে চলে যাবার পর স্বভাবতই আমেরিকানদের আসার কথা। কিন্তু তারা আসেনি। এল ইসরায়েলিরা। ধীরে ধীরে জানা গেল, এডেন ও সোকোট্রা দ্বীপের ঘাঁটির সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও স্থাপনা নিজের জন্যে কেনেনি যুক্তরাষ্ট্র, কিনেছে ইসরায়েলের জন্যে। এই খবর মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা রাষ্ট্রকে স্বভাবতই বিচলিত করে তুলল–বিশেষ করে সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, মিশর ও

বাহরাইনকে। নানা রকম বিধি-নিষেধ থাকায় এ-সব রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স অ্যাকটিভিটি ইয়েমেনে নেই বললেই চলে। দুই দেশের মাঝখানে সীমান্ত থাকায় সৌদি আরব মাঝে মধ্যে দু'একজন স্পাইকে পাঠায় এডেনের ইসরায়েলি ঘাঁটিতে আসলে কি ঘটছে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে। ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে আসে তারা, ঘাঁটির আশপাশে দু'চারদিন ঘুর ঘুর করে, তারপর খালি হাতে ফিরে যায়। তবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত লিবিয়ার এসপিওনাজ নেটওঅর্ক খুবই শক্তিশালী, এডেনে তাদের অনেক স্পাই আছে। তা থাকলেও, তাদের মধ্যে লিবিয়ান নেই একজনও। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে ইয়েমেনে লিবিয়ানরা ঢোকে না, মোটা টাকা মাসোহারা দিয়ে স্থানীয় ইয়েমেনিদের কাজে লাগিয়েছে তারা। এই ভাড়াটে স্পাইরা সবাই সন্ত্রাসী, ত্রিপোলিতে তথ্য পাচার করে লুকানো রেডিও যোগে। এদেরকে যেহেতু চেনার কোন উপায় নেই, তাই সাহায্য চাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রগুলো লিবীয়াকে তেমন একটা বিশ্বাসও করে না। সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় লিবীয়াকে পারতপক্ষে এড়িয়েই চলা হয়।

বাকি থাকল সবেধন নীলমণি রানা এজেন্সির এডেন শাখা। তবে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রগুলো এডেন শাখায় নয়, যোগাযোগ করল এজেন্সির হেডকোয়ার্টার লন্ডনে–সবাই নয়, সবার প্রতিনিধি হয়ে সৌদি আরব। এডেন ও সোকোট্রা দ্বীপের ঘাঁটিতে ইসরায়েলিরা ঠিক কি ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, মিসাইল মোতায়েন করছে কিনা, করলে সে-সব মিসাইলের পাল্লা কত ইত্যাদি তথ্য জরুরী ভিত্তিতে জানা দরকার তাদের। সৌদি ইন্টেলিজেন্স চীফ আল মুসা সাব্বানা নিজেই লন্ডনে এসে দেখা করলেন মাসুদ রানার সঙ্গে।

প্রথমে ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি রানা। আল মুসা সাব্বানা প্রায় বন্ধুস্থানীয়ই বলা যায়, অনেকটা তাঁর সম্মান রক্ষার্থেই এজেন্সির এডেন শাখাকে ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেয় ও।

হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ পেয়ে কাজে নেমে পড়ল রূপক মির্জা। দিন পনেরো ব্যর্থ চেষ্টার পর একদিন জেলের ছদ্মবেশ নিয়ে ইসরায়েলিদের ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ল ওরা। ঘুরেফিরে যা দেখল তাতে প্রায় মাথা খারাপ হবার যোগাড়। ইসরায়েলিরা এডেনে এত বেশি অস্ত্র আর গোলাবারুদ আনছে, ঘাঁটিটা বিশাল হওয়া সত্ত্বেও ওগুলো রাখার জায়গা হবে না। তাহলে ওগুলো যাচ্ছে কোথায়? খোঁজ নিতে গিয়ে মির্জা জানতে পারল, এডেন বন্দরটাও এক অর্থে ইসরায়েলিরা দখল করে নিয়েছে, কাজেই ওটাকে যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে তাদের কোন সমস্যা হচ্ছে না। বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ কোথায় যাচ্ছে সে-রহস্যও পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর রূপক একটা গুজব শুনল। ইসরায়েল থেকে অত্যন্ত গোপনীয় একটা মারণাস্ত্র আসছে এডেনে, সেটা পাঠানো হবে সোকোট্রা দ্বীপে। কি সেই মারণাস্ত্র, জানার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল মির্জা আর আব্বাস। কিন্তু হঠাৎ করে পোর্ট সিকিউরিটি এত কড়াকড়ি শুরু করল, ভেতরে ঢোকা তো দূরের কথা, ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারল না ওরা। তারপরই শুরু হলো হুমকি দিয়ে ফ্যাক্স আর টেলিফোন আসা।

ফ্যাক্সে শেষ হুমকিটা আসার এক ঘণ্টা পর ইয়েমেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর

একদল সশস্ত্র অফিসার শাখা অফিসে এসে ঢুকল। তাদের অভিযোগ এই অফিস থেকে তাদের দেশের জন্যে ক্ষতিকর তৎপরতা চালানো হচ্ছে। প্রতিবাদ করায় রূপক মির্জা ও আলি আব্বাসকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হলো। র‍্যাক ও কেবিনেটের সমস্ত ফাইল পরীক্ষা করার পর ছিঁড়ে ফেলল তারা। এ-ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল মির্জা, তাই তদন্তের কোন রিপোর্টই অফিসে রাখেনি সে, যখন যা জানতে পেরেছে সব ফ্যাক্স যোগে পাঠিয়ে দিয়েছে লন্ডনে। কিন্তু সে জানে না, তার পাঠানো সব ফ্যাক্সই স্থানীয় ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে মাঝপথে আটকে দিয়েছে মোসাড, ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স। অর্থাৎ এখানে কি ঘটছে সে-সম্পর্কে রানার কোন ধারণাই নেই।

ইয়েমেন ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে পরিচয় দিলেও, লোকগুলো আসলে মোসাড এজেন্ট। তিন কামরার অফিস তছনছ করে ফিরে যাবার আগে ভেতরে একজোড়া শক্তিশালী টাইম বোমা রেখে গেল তারা। তল্লাশী চালাবার সময় মির্জা আর আব্বাসকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, বোমা সম্পর্কে কিছুই তারা জানতে পারল না।

এক ঘণ্টা পর, অফিস গোছগাছ করার কাজ তখনও শেষ করতে পারেনি ওরা, একযোগে বিস্ফোরিত হলো বোমা দুটো—একটা ওয়াল কেবিনেটের পিছনের দেয়ালে ছিল, দ্বিতীয়টা ছিল ভেন্টিলেটরের ভেতর। গোটা অফিস সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো, স্তূপটাকে গ্রাস করল দাউ-দাউ আগুন। কাছেই ফায়ারব্রিগেড স্টেশন, আগুন নেভাবার জন্যে ছুটে এল তারা। আগুনে ঝলসানো মির্জা আর আব্বাসকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা হলো। পথেই মারা গেল আব্বাস। মির্জাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও সেখানে বার্ন ইউনিট না থাকায় তার প্রায় কোন চিকিৎসাই হলো না। এক সৌদি ব্যবসায়ী, খায়ের খুররম, তখন এডেনে রয়েছে। মির্জার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। খুররম আসলে সৌদি ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট, এডেনে এসেছে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে, ব্যক্তিগত প্লেন নিয়ে। মির্জাকে নিজের প্লেনে তুলে নিল সে, পৌঁছে দিল জেদ্দার রেড ক্রিসেন্ট হসপিটালে।

খবর পেয়ে চার্টার করা প্লেন নিয়ে সেদিনই জেদ্দায় পৌঁছুল রানা। ও পৌঁছুবার চব্বিশ ঘণ্টা পর মারা গেল মির্জা। চব্বিশটা ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্ত তার পাশে বসে থাকল রানা। মারা যাবার আগে দু'বার মাত্র জ্ঞান ফিরে পায় মির্জা। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সে তার প্রিয় মাসুদ ভাইকে যত বেশি সম্ভব তথ্য দেয়ার চেষ্টা করেছে, কথা বলতে বারণ করা সত্ত্বেও শোনেনি। মারা যাবার আগে শোভন চৌধুরী কে, টেলিফোনে মোসাড কেন তার নাম উল্লেখ করেছিল, এই প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে সে।

শোভন চৌধুরী মাসুদ রানার মতই বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একজন অন্যতম দুর্ধর্ষ স্পাই। ছ'মাস আগে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি করে পাঠানো হয় তাকে, বিশেষ নির্দেশ ছিল আরব সাগরের ওপর নজর রাখতে হবে। এই দায়িত্ব পালন করার সময়, চার মাস আগে নিখোঁজ হয় সে। ঠিক কোত্থেকে,

কি কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়, এতদিন তা জানা যায়নি। মোসাডের টেলিফোন পাবার পর এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার, শোভনকে ইসরায়েলিরা খুন করে লাশ গুম করে ফেলেছে।

মির্জার লাশ ঢাকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে রিয়াদে চলে এল রানা। শোভন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা রিপোর্ট পাঠাল বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায়। বিসিআই ও রানা এজেন্সির তিনজন এজেন্ট খুন হয়ে গেছে, শোককে ছাড়িয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে অদম্য ক্রোধ, সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে প্রতিশোধ গ্রহণের তাগাদা, তাসত্ত্বেও বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের কাছ থেকে কোন নির্দেশ বা পরামর্শ চায়নি রানা, বরং অনির্দিষ্টকালের জন্যে ছুটি চেয়ে রিপোর্টের সঙ্গে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে।

রানার রিপোর্ট বিসিআই হেডকোয়ার্টার অ্যাকনলেজ করল না। শুধু ফ্যাক্সযোগে জানিয়ে দেয়া হলো, ওর ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। রাহাত খান রানার মনের কথা পড়তে পারেন, তিনি জানেন রানা এখন কি করবে। কাজটা রানা আনঅফিশিয়ালি করতে চায়। তাতে তাঁরও সমর্থন আছে। আন্তর্জাতিক আইন ভাঙার কাজে অফিশিয়াল অনুমোদন দেয়া চলে না।

মির্জা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে গেছে, কিন্তু তারপরও সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবার জন্যে সৌদি, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন ও ওমানের ইন্টেলিজেন্স চীফের সঙ্গে মীটিঙে বসতে হলো রানাকে। জানা গেল, এডেন ও সোকোট্রা দ্বীপ হাতে পেয়ে ইসরায়েল ওগুলোকে নিজেদের প্ল্যান ধরে নতুন করে সাজাচ্ছে, সেই সঙ্গে অত্যাধুনিক অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডারও গড়ে তুলছে। উদ্দেশ্য লোহিত সাগর, গালফ অভ এডেন ও অ্যারাবিয়ান গালফ পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা, যুদ্ধাবস্থা দেখা দিলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যাতে এই তিনটে জলপথ ব্যবহার করতে না পারে। তবে শুধু জলপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যে এত বিপুল অস্ত্র মওজুদ করার প্রয়োজন হয় না। এ-সব যে আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে, অন্তত রানার মনে এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ইসরায়েলিরা সোকোট্রা দ্বীপে কি ধরনের অস্ত্র জমা করছে জানার পর ওর এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো।

মীটিং চলছে, রানার অনুরোধে আলোচ্য এলাকার একটা ম্যাপ টাঙানো হলো দেয়ালে। এডেন ঘাঁটিতে তেমন কোন পরিবর্তন আনা হয়নি, মুকালা নামে অন্য একটা দ্বীপেও ইসরায়েলিরা এখন পর্যন্ত শক্তভাবে আসন গেড়ে বসেনি। তারা পুরোদমে কাজ চালিয়ে সোকোট্রা দ্বীপের ন্যাভাল বেসটাকে অত্যাধুনিক করে তুলেছে। আফ্রিকার শিং থেকে খানিক দূরে ওটা, বোতলের ছিপি বলা যায়। মাত্র চার মাসে প্রায় অসাধ্যসাধন করেছে তারা—তৈরি করেছে অয়েল স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি, মিসাইল সাইট ও রাডার ট্র্যাকিং স্টেশন। সর্বশেষ ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, এডেন থেকে চল্লিশটা যুদ্ধজাহাজ সোকোট্রা দ্বীপে আসা-যাওয়া করছে, সেগুলোর মধ্যে পেট্রল বোট থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার সাবমেরিনও আছে। নিউক্লিয়ার সাবমেরিন! কিন্তু নিউক্লিয়ার সাবমেরিন ইসরায়েলিরা পাবে কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে বেশি কাঠখড় পোড়াতে

হলো না। ওগুলো ইসরায়েল পেয়েছে আরব রাষ্ট্রগুলোর বন্ধু বলে পরিচয় দিচ্ছে উচ্চকণ্ঠ আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায়। ঘাঁটিগুলোর ফ্যাসিলিটি আমেরিকা যখন রাশিয়ার কাছ থেকে কিনতে চাইল, তালিকায় নিউক্লিয়ার সাবমেরিনও ছিল। স্বভাবতই বিস্মিত হয় রাশিয়া–আমেরিকার তো উন্নতমানের নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের অভাব নেই, তাহলে ওদের পুরানো জিনিস তারা কেন কিনতে চাইছে। আমেরিকাকে প্রশ্ন করে রাশিয়া কোন উত্তর পায়নি, তবে সেটা তারা আন্দাজ করে নিতে পারে। এডেন, মুকালা ও সোকোট্রা ঘাঁটির ফ্যাসিলিটি যে আমেরিকা নিজের জন্যে কিনছে না, এটা তারা সম্ভবত প্রথম থেকেই জানত। বড় ধরনের যুদ্ধ শুরু হলে, তিনটে উপসাগর ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকায়, আরব রাষ্ট্রগুলো ভারত মহাসাগরে বেরুতে পারবে না, এই স্ট্র্যাটেজির প্রতি রাশিয়ার সমর্থন না থাকলে ঘাঁটিগুলো তারা আমেকিার মাধ্যমে ইসরায়েলের হাতে তুলে দিত না।

আরব রাষ্ট্রগুলোর জন্যে সোকোট্রা দ্বীপের ইসরায়েলি ন্যাভাল বেস বিরাট একটা হুমকি। মীটিঙে উপস্থিত ইন্টেলিজেন্স চীফরা আশা করেছিলেন রানা এজেন্সির ডিরেক্টর এই বিপজ্জনক সমস্যার একটা সমাধান দিতে পারবেন। কিন্তু রানা তাঁদেরকে হতাশ করল। ও বলল, 'সোকোট্রা ন্যাভাল বেস উড়িয়ে দেয়াই একমাত্র সমাধান, কিন্তু তা কি আর সম্ভব!' কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হলো মীটিং, তবে সৌদি ইন্টেলিজেন্স চীফ মুসা সাব্বানাকে রানা কথা দিল, প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবে ও।

রিয়াদে আরও একটা দিন থাকার সিদ্ধান্ত নিল রানা। ফাইভ স্টার হোটেলে আরাম-আয়েশের কোন অভাব নেই, তবু সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখছে প্রায় অসম্ভব একটা কাজকে কোনও ভাবে সম্ভব করা যায় কিনা। এ যেন ডেভিড আর গোলিয়াথ-এর প্রতিযোগিতা, ডেভিডের আধুনিক সংস্করণ মাসুদ রানার বিজয়ী হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। অথচ সমস্যার বিশালতা আর জটিলতা ওকে যেন একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, কল্পনার দিগন্ত আরও প্রসারিত করার তাগাদা দিচ্ছে, রাত জাগিয়ে বসিয়ে রেখে চিন্তা করাচ্ছে। এক পর্যায়ে গোটা সমস্যাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করল রানা, তারপর একটা করে টুকরো নিয়ে মাথা ঘামাল।

অবশেষে উপায় একটা বেরুল। আইডিয়াটা শুধু বিপজ্জনক নয়, পাগলের উদ্ভট খেয়ালও বলা যেতে পারে। তবে ক্ষীণ হলেও সফল হওয়ার একটু সম্ভাবনা আছে।

প্রচলিত সমস্ত কৌশলই বিবেচনা করে দেখেছে রানা। সাগর বা আকাশ পথ ব্যবহার করে সোকোট্রা দ্বীপে পৌঁছানো যায়। সাগরের সারফেস বা পানির তলা থেকে আক্রমণ করা যায়। আকাশের অনেক ওপর থেকে বা খুব নিচু দিয়ে প্লেন নিয়ে উড়ে যাবার সময় বোমা ফেলা যায়। অবাস্তব, তাই প্রতিটি সম্ভাবনা বাতিল করে দিল ও। এই কাজে একটাই মাত্র শর্ত–আক্রমণটা কে করল তা যেন কোনভাবেই বুঝতে না পারে ইসরায়েল। এমন কোন প্রমাণ রাখা চলবে না যা দেখে তারা পরে বুঝতে পারে তেলসমৃদ্ধ আরব রাষ্ট্র ও অ্যাটাকিং ফোর্স-এর মধ্যে

কোনও যোগাযোগ ছিল।

টেবিলে ম্যাপের ভাঁজ খুলে ঝুঁকে পড়ল রানা। নীল সাগর ঘিরে রেখেছে সোকোট্রা দ্বীপটাকে। নিঃসঙ্গ, সীমাহীন সাগরের বুকে একটা পাহাড়। সাগরের সারফেস ধরে যাবার উপায় নেই, দিনের বেলা খালি চোখেই দেখে ফেলবে, রাতে ধরা পড়ে যাবে রাডারে। ওর দৃষ্টি বারবার আসা-যাওয়া করছে ওমান আর দক্ষিণ ইয়েমেনে, প্রতিবার মনোযোগ কাড়ার চেষ্টা করছে এডেন।

এডেনের দিকে তাকালেই, চোখের দৃষ্টি লাফ দিয়ে চলে যাচ্ছে সোকোট্রা দ্বীপে, যেন অদৃশ্য একটা সুতো দুটো জায়গাকে এক করে রেখেছে। হঠাৎ আইডিয়াটা খেলল মাথায়।

এডেন থেকে সোকোট্রা দ্বীপে পৌঁছুনোর একমাত্র নিরাপদ উপায় হলো একটা ইসরায়েলি জাহাজ। সোকোট্রা দ্বীপের ন্যাভাল বেসের ইসরায়েলি নৌ-সেনাদের কাছে যে জাহাজ প্রত্যাশিত ও পরিচিত। এরকম জাহাজ অনেকই আছে। প্রশ্ন হলো, রানার জন্যে দলবল নিয়ে ওঠা সহজ কোনটায়? হপ্তায় বা মাসে কতবার আসা-যাওয়া করে সেটা? কি ধরনের কার্গো বহন করে? জাহাজটার ওজন কত, সব মিলিয়ে কজন ক্রু থাকে?

তারপর মির্জার শোনা একটা গুজবের কথা মনে পড়ল রানার—ইসরায়েল থেকে অত্যন্ত মারাত্মক একটা মারণাস্ত্র আসছে এডেনে, সেটা পাঠানো হবে সোকোট্রা দ্বীপে। কি সেই মারণাস্ত্র? সোকোট্রা ন্যাভাল বেসে কিভাবে পাঠানো হবে?

অসংখ্য প্রশ্ন, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর না পেলে কাজে হাত দেয়া যাবে না। প্রচুর তথ্য দরকার, নইলে প্ল্যান তৈরি করা সম্ভব নয়। প্রস্তুতি পর্বটাও হবে দীর্ঘ। এই কাজে দক্ষ প্রফেশন্যাল লোকজন দরকার হবে।

রিয়াদ থেকে আমস্টারডামে চলে এল রানা। গোপন তথ্য, দক্ষ মার্সেনারি, প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট, সবকিছুই এখানে ভাড়ায় অথবা নগদ টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। রাস্তায় রাস্তায় সেক্স-শপ, অলিতে-গলিতে অস্ত্রের গুদাম, বার আর কাফেতে ব্রীফকেস ভর্তি গোপন তথ্য আর ডলার হাতবদল হচ্ছে।

কোথায় কার কাছে কি পাওয়া যাবে, জানা আছে রানার। হিলটনেই উঠল ও, নির্দিষ্ট একটা নম্বরে ডায়াল করে অপেক্ষায় আছে। বিশ মিনিট পর নক হলো দরজায়। হাতে রিভলভার নিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। 'কে?'

'নেগাই মেনেম, মি. রানা।'

দরজা খুলে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল রানা। যেন কোন মানুষ নয়, গড়িয়ে ভেতরে ঢুকল একটা প্রকাণ্ড ফুটবল। নিজের কাঠামো সম্পর্কে সচেতন মেনেম, তাই চৌকো আকৃতির সাদা-কালো ছাপমারা কাপড়ের শার্টই সাধারণত পরে সে। লোকে বলে এই শার্ট মেনেমের একটা সাইনবোর্ড, আমস্টারডামে আর কাউকে পরতে দেখা যায় না।

নামটা ছদ্মনাম, নেগাই মেনেম আসলে খাস জার্মান। আসল নাম কেউ জানে না, রেকর্ড-পত্র বদলে ফেলায় প্রকৃত পরিচয় কোনদিনই জানা যাবে না। হিটলার কবেই মরে ভূত হয়ে গেছে, কিন্তু মেনেমের কাছে আজও তিনি নমস্য ও পূজনীয়

ব্যক্তি। তার চরিত্রের বৈপরীত্য সম্পর্কে খুব কম লোকই খবর রাখে, যারা রাখে তাদের কাছে মেনেম একটা বিস্ময়। প্রচণ্ড রকম ইহুদি বিদ্বেষী লোক সে, অথচ তার সেক্স-শপ আর বারের বেশিরভাগ খদ্দেরই ইহুদি। ইসরায়েলের দূতাবাসেও ঘন ঘন আসা-যাওয়া আছে তার। ইসরায়েলিরা তার কাছ থেকে নিয়মিত গোপন সামরিক তথ্য কেনে, সেই সূত্রে ইসরায়েলিদের অনেক গোপন তথ্যও জানার সুযোগ ঘটে তার, সেগুলো সে বাছাই করা কয়েকজনের কাছে বিক্রি করে উপরি দু'পয়সা-আয় করে—তাদের মধ্যে রানাও একজন।

দরজা বন্ধ করে ঘুরল রানা, দেখল ইতিমধ্যে সোফায় বসে দ্রুত তালে পা দোলাতে শুরু করেছে মেনেম। এটা তার নার্ভাস হয়ে পড়ার লক্ষণ, জানে ও। 'অনেক দিন পর ডাকলেন, হের মাসুদ রানা। কি দরকার কম কথায় বলুন, আমিও তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে কেটে পড়ব।'

'এতই যদি ধরা পড়ে যাবার ভয়, গায়ে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে এলেন কোন বুদ্ধিতে?' রানা অসন্তুষ্ট।

হাসিতে ফেটে পড়ল ফুটবল। 'এই সাইনবোর্ড নিয়ে তিনজন ঢুকেছে হোটেলে, বাকি দু'জনকে আমার ক্লোনও বলতে পারেন। বলুন, হের রানা, বলুন!'

'এডেনের আর্মি বেস আর সোকোট্রা ন্যাভাল বেস এখন ইসরায়েলের হাতে, এ তো আপনি জানেনই,' বলল রানা। 'আমি জানতে চাই, এডেন থেকে কি ধরনের জাহাজ সোকোট্রায় যায়, কতদিন পরপর। সেগুলোর মধ্যে কোনটা হাইজ্যাক করা সহজ।'

চোখের পলক পড়ল না, যেন মুখস্থ করা আছে, গড়গড় করে বলে যাচ্ছে মেনেম, 'একটা সাপ্লাই শিপ, হপ্তায় একবার। জাহাজটা—স্পারাটাক-ক্লাস ভেসেল। ফিফটিন হানড্রেড টন গ্রস। কার্গো ডেডওয়েট টুয়েলভ হানড্রেড অ্যান্ড থারটিফোর টু ফরটিন হানড্রেড অ্যান্ড নাইনটিফোর টনস। সব মিলিয়ে পঁচিশজন ক্রু, অফিসার সহ। কাগজ-পত্রে ওদেরকে ইসরায়েলি মার্চেন্ট মেরিন বলা হলেও, সবাই আসলে ন্যাভাল রিজার্ভ অফিসার, ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। রেডিও অপারেটর একটা মেয়ে।'

'তারমানে প্রফেশনাল। কার্গো সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'বেশি কিছু না। সাধারণ সাপ্লাই। খাবার, কাপড়চোপড়। তবে মাঝে মধ্যে অস্ত্র আর গোলাবারুদও পাঠানো হয়। কি ধরনের অস্ত্র, আমার জানা নেই।'

'নতুন কোন আধুনিক অস্ত্র সম্পর্কে কিছু শুনেছেন, ইসরায়েল থেকে এডেনে পৌছুবে?'

মাথা নাড়ল মেনেম। 'আপনি বললে আজ থেকেই কান পাতি।'

'আমার হাতে সময় কম,' বলল রানা। 'সবই খুব তাড়াতাড়ি জানতে চাই আমি।'

হাতঘড়ি দেখল মেনেম। 'ক্লোনদের সঙ্গেই বেরিয়ে যাব, হের রানা। আমাকে দেরি করিয়ে দেবেন না, প্লীজ!'

'নামগুলো মনে রাখতে পারবেন, লিখে না নিলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বিনয়ে বিগলিত হলো মেনেম। 'হের রানা, আপনি আমার মেমোরিকে

চ্যালেঞ্জ করছেন।'

'আবু সাদাত, দিল নওশাদ, বিন কাসেম, সালমা শিরিন, মুনির মোস্তফা, গোলাম বাখারা, সালভিক রাহমানভ, শেখ শামস, সৈয়দ ইয়াজদানি, আয়েন জামাল,' থামল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'রিপিট করুন।'

গড়গড় করে নামগুলো পুনরাবৃত্তি করল মেনেম, চোখ দুটোয় কৌতুক চিকচিক করছে। 'দু'একজনকে পাব না, তারা আমস্টারডামে নেই। যাদেরকে পাব, কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা করবে?'

'আপনার তিন নম্বর সেফ-হাউসে। কাল রাত দশটায়। যে-ক'জনকে পান, সময় দেবেন সাড়ে দশটায়।'

'দশ হাজার ডলার,' বলে সোফা ছাড়ল মেনেম।

'চেকটা আমি কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দেব,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা।

দরজার কাছ থেকে মেনেম জানতে চাইল, 'আমার তাহলে কান পেতে থাকার দরকার নেই?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'আছে। তবে কার হয়ে কান পাতছেন তা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ টের না পায়। আর যদি মুখ খুলতে হয়, একশো ভাগ নিশ্চিত হয়ে নেবেন আপনার কথা দু'কান হবে না।' এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'হোটেল ছেড়ে কোথাও আমি বেরুচ্ছি না। কোন খবর থাকলে ফোন করবেন।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল মেনেম।

দরজা বন্ধ করে চিন্তায় ডুবে গেল রানা। মনের ভেতর প্ল্যান একটা তৈরি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাতে বড় একটা ক্রটি থেকে যাচ্ছে। সমস্যাটাকে নানাদিক থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে, কিন্তু ক্রটি সারাবার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। সোকোট্রা হারবারের ভেতর হয়তো জাহাজটা বিস্ফোরিত হলো, কিন্তু তারপর টীম নিয়ে পালিয়ে আসবে কিভাবে ওরা? পালিয়ে আসার পথ খোলা না রেখে সোকোট্রা ন্যাভাল বেস উড়িয়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দক্ষ লোকের পরামর্শ দরকার হবে, জাহাজে কি পরিমাণ বিস্ফোরক থাকলে হারবার ফ্যাসিলিটি সহ ন্যাভাল বেস ধ্বংস করা সম্ভব? এ-ব্যাপারে অবশ্য রানা এজেন্সির জিয়া হাসানকে কাজে লাগানো যাবে।

মেনেমকে যাদের নাম বলা হয়েছে সবাই তারা মার্সেনারি, রানার পরিচিত ও অনুগত। সবাইকে পাওয়া না গেলে সমস্যা। নতুন, অচেনা লোককে দলে রাখলে ঝুঁকি বাড়ে। ও যাদেরকে চাইছে তারা প্রায় সবাই হিব্রু ভাষা জানে। সালমা শিরিন ওর দারুণ ভক্ত। পেশায় সে ওঅর-করিসপনডেন্ট, ফ্রী-ল্যান্সার, বেশিরভাগ সময় জর্দান আর লেবাননে দায়িত্ব পালন করে, হিযবুল্লাহ গেরিলাদের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল, গেরিলারা প্রায় সবাই তাকে চেনে, বিশ্বাস ও সমীহ করে। সালমার বাবা মিশরীয় জাহাজ-ব্যবসায়ী, মা বাংলাদেশী ডাক্তার। রেডিও ব্যবহারে অভ্যস্ত, সেজন্যেই তাকে দরকার রানার। তাছাড়া, পেশায় ওঅর-করিসপনডেন্ট হলেও, গেরিলা ফাইট-এর ট্রেনিংও নেয়া আছে তার।

তিন ঘণ্টা পর, সন্ধ্যা সাতটায় ফোন করল মেনেম। 'আপনি ভদ্রলোককে চেনেন। একজন ব্রিগেডিয়ার। বলছেন আপনার সঙ্গে উপকার বিনিময় করতে

ব্যাকুল হয়ে আছেন। আপনি রাজি হলে আজ রাতেই আমার চার নম্বর সেফ-হাউসে ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার দেখা হতে পারে।'

'ব্রিগেডিয়ার?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আমি চিনি?'

'সাখাওয়াৎ ফারাজি।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা, পরমুহূর্তে ঢিল পড়ল পেশীতে। সাখাওয়াৎ ফারাজি লিবীয় ইন্টেলিজেন্স-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। বেশ কয়েক বছর আগে, ফারাজি তখন মেজর, রানার সঙ্গে পরিচয় ছিল। সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে লিবীয়ার চিহ্নিত হবার পর থেকে তাঁর সঙ্গে ওর কোন যোগাযোগ নেই। ইতিমধ্যে তিনি বিগ্রেডিয়ার হয়েছেন, এ-খবর অবশ্য আগেই শুনেছে রানা।

'মি. রানা, আপনি লাইনে আছেন?'

রানা জবাব দিল, 'না।'

'না! কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে বলেছেন, তাঁর প্রস্তাবে আপনিও কম উপকৃত হবেন না। আমি আপনার সম্পর্কে তাঁকে কোন তথ্য দিইনি, অথচ তিনি বলছেন আপনার বর্তমান সমস্যা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। বলছেন, 'আপনার সমস্যার সমাধান তাঁর হাতে তৈরি হয়েই আছে।'

লিবীয়া সম্পর্কে এসপিওনাজ জগতের সবারই এখন অ্যালার্জি, রানার ইতস্তত করার সেটাই কারণ। তবে ফারাজির প্রস্তাবটাও লোভনীয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিদ্ধান্ত পাল্টাল ও। 'ঠিক আছে। আজ রাতে কখন?'

'ন'টায়।'

যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

ফিল্ড এজেন্ট থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ও মেজর থেকে ধাপে ধাপে ব্রিগেডিয়ার হওয়া সত্ত্বেও অতীতের মতই রানাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানালেন সাখাওয়াৎ ফারাজি, অনুরোধ করলেন তাঁকে যেন রানা নাম ধরেই সম্বোধন করে। অত্যন্ত সতর্ক ও বিবেচক, সময়ের মূল্য দেন; সংক্ষেপে পরিষ্কার একটা ধারণা দিলেন লিবীয়া ইয়েমেনে কি ধরনের ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা চালাচ্ছে। নেটওঅর্কটা যে সত্যি শক্তিশালী, সেটা উপলব্ধি করতে পারল রানা। ফারাজি প্রসঙ্গক্রমে জানালেন, ইয়েমেনে তাঁদের এই নেটওঅর্ক থাকাতেই এডেনে রানা এজেন্সির পরিণতি কি হয়েছে তার রিপোর্ট পৌঁছে গেছে ত্রিপোলিতে। রিপোর্টটা পেয়েই তিনি আন্দাজ করে নেন রানা এরপর কি করবে, কোথায় যাবে। তাঁর ধারণা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, আমস্টারডামে এসে পেয়ে গেছেন ওকে।

ভূমিকা সেরেই কাজের কথা পাড়লেন ব্রিগেডিয়ার ফারাজি। 'সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সম্পর্কে আশা করি নতুন করে তোমাকে কিছু বলার নেই, তাই না?'

'ওগুলো হিট-সীকিং, জেটের এগজস্ট গ্যাস টার্গেট করে।'

'রাইট। সাধারণ একটা স্যাম ক্ষেপণাস্ত্রকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে প্রচলিত পদ্ধতিটা হলো, প্লেনের টেইল পড থেকে থারমাইট বোমা ইজেক্ট করা, অর্থাৎ বিকল্প একটা হিট-সোর্স তৈরি করা। বেশি উত্তাপ পাওয়ায় সেদিকে ঘুরে যায়

ক্ষেপণাস্ত্র, কোন ক্ষতি না করে বিস্ফোরিত হয়। এবার, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। কি ঘটবে নতুন আবিষ্কৃত একটা স্যাম যদি আসল টার্গেট আর বিকল্প হিট-সোর্স আলাদাভাবে চিনতে পারে?'

'বিপুল এক্সপ্লোসিভ হার্ডওয়্যার বাতিল বা অকেজো হয়ে যাবে,' ধীরে ধীরে বলল রানা।

'ঠিক তাই! অবশ্য ফাইটার বম্বারকে ফেলে দেয়ার একটা পদ্ধতি এরইমধ্যে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, ক্ষেপণাস্ত্রে ইনফ্রা-রেড ডিভাইস থাকে, যার কাজ হলো সেক্টর রাডার নেট-এর সুইচ অফ করিয়ে রাখা, ফলে প্লেনের ইসিএম জানাতে ব্যর্থ হয় আক্রমণ শুরু হয়েছে। ফলাফল সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতির বিপদ হলো রাডার ব্ল্যাকআউটের সময় সেক্টরে অন্য একটা অ্যাটাকার ঢুকে পড়তে পারে, বোমা ফেলে বা গুলি ছুঁড়ে ধ্বংস করে দিতে পারে ক্ষেপণাস্ত্রগুলোকে। কাজেই নতুন আবিষ্কৃত সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল প্রসঙ্গে আবার আমাকে ফিরে আসতে হচ্ছে।'

'এই নতুন ক্ষেপণাস্ত্র আমেরিকা আবিষ্কার করেছে, ওদের কাছ থেকে পেয়েছে ইসরায়েলিরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পরীক্ষা করা হয়েছে দু'বছর আগে, আরিজোনায়,' মাথা ঝাঁকিয়ে জানালেন ফারাজি। 'খুশির খবর, পরীক্ষা চালাবার সময় এয়ারফ্রেম মেকানিক হিসেবে আমাদের একজন গুপ্তচর ছিল ওখানে। পাইলটবিহীন টার্গেট এয়ারক্রাফটের ওপর এক্সপেরিমেন্টটা চালানো হয়। হাই সিকিউরিটি এরিয়ায় ঢুকতে পারেনি সে, যতটুকু দেখেছে ও শুনেছে, আমাদেরকে রিপোর্ট করেছে। তবে বাকিটা আন্দাজ করে নিয়েছি আমরা।'

'এ-সব কথা আমাকে কেন শোনাচ্ছ তুমি?'

'আমার কথা শেষ হোক, তাহলেই জবাব পেয়ে যাবে,' বললেন ফারাজি। 'রাশিয়ার একটা স্পাই স্যাটেলাইট আরও অনেক পরে আরিজোনার এক্সপেরিমেন্ট এরিয়ার ছবি তোলে। কিছু ছবি আমাদের হাতেও এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে আমেরিকানদের তৈরি এই নতুন কিলার মিসাইল একটা টার্গেটও মিস করে না, অর্থাৎ হানড্রেড পার্সেন্ট নিখুঁত। আমেরিকানরা এই মিসাইলের নাম দিয়েছে "স্নিফার"। আমাদের কাছে খবর আছে, এরইমধ্যে বেশ কিছু স্নিফার ইসরায়েলে পৌঁছেছে। ইসরায়েল এখন ওগুলো এডেনে পাঠাচ্ছে, সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে সোকোট্রা ন্যাভাল বেসে।'

রানার চেহারা নির্লিপ্ত, তবে মাথার ভেতর দ্রুত চিন্তা চলছে। কোন সন্দেহ নেই, ওর সমস্যার সমাধান একটা প্লেটে সাজিয়ে পরিবেশন করার অনুমতি চাইছেন ফারাজি।

'সোকোট্রা এখন ইসরায়েলি ন্যাভাল বেস,' বলে যাচ্ছেন ফারাজি। 'আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে, দ্বীপটার এয়ারস্ট্রিপ বড় আকৃতির প্লেন নামার উপযোগী নয়। সেজন্যেই ইসরায়েল ক্ষেপণাস্ত্রগুলো প্রথমে এডেনের আর্মি ও এয়ার বেসে আনছে। ওখান থেকে জাহাজে তুলে সোকোট্রায় নিয়ে যাওয়া হবে।'

'এবার আসল কথাটা বলে ফেলো,' তাগাদা দিল রানা।

মুচকি একটু হাসলেন ফারাজি। 'আমি তোমার কাছে নিরেট একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, রানা। এডেনে আমাদের ইন্টেলিজেন্স নেটওঅর্ক সম্পর্কে তুমি জানো। ইসরায়েলি জাহাজ মিসাইল নিয়ে কখন রওনা হবে, এটা সময়ের আগেই জানতে পারব আমরা। টীম সহ তোমাকে আমরা তুলে দেব ওই জাহাজে। কিভাবে তা সম্ভব, এখুনি জানতে চেয়ো না। আমি হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চয়তা দিচ্ছি। জাহাজে ওঠার পর সময়-সুযোগ মত ওটা তোমরা হাইজ্যাক করবে, নিয়ে যাবে আমাদের নির্ধারিত রনদেভোয়, সেখান থেকে তোমাদেরকে তুলে নেবে আমাদের একটা সাবমেরিন, মিসাইল সহ। সাবমেরিন কমান্ডারের ওপর নির্দেশ থাকবে, টীম সহ তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে মালদ্বীপে। ওখানে একটা চার্টার করা প্লেন অপেক্ষা করবে, পৌঁছে দেবে তোমাদেরকে যে যেখানে যেতে চাও।'

'ক'টা ক্ষেপণাস্ত্র দরকার তোমাদের?' জানতে চাইল রানা।

'নমুনা হিসেবে একটাই,' বললেন ফারাজি। 'ওটার মেকানিজম দেখে নিজেরাই আমরা বানিয়ে নিতে পারব যত খুশি।'

এই কাজে তোমাদেরকে আমি সাহায্য করতে পারি না, মনে মনে বলল রানা। জানতে চাইল, 'এই মিসাইলের সাইজ কি?'

'ওঅরহেড সহ এই ধরো চল্লিশ ফুট।'

রানার ভুরু সামান্য উঁচু হলো। 'এ-ধরনের অপারেশন রাতেই শুধু সম্ভব, তাই না? এই সাইজের মিসাইল একটা সাবমেরিনে কিভাবে ট্র্যান্সফার করা সম্ভব?'

'ব্ল্যাকমার্কেট থেকে শুধু এই মিশনের জন্যে মার্কিনীদের একটা চিনুক হেলিকপ্টার কিনেছি আমরা। কয়েক বছর আগে আফগানিস্তানে নিখোঁজ হয় ওটা। চিনুকের সাধারণ রেইঞ্জ দুশো মাইল, তবে অতিরিক্ত ফুয়েল ভরার ব্যবস্থা করায় রনদেভোয় পৌঁছুতে কোন সমস্যা হবে না। ওমান উপকূল, সালালাহ্ থেকে রওনা হবে ওটা, রনদেভোয় পৌঁছে মিসাইল সহ তোমাদেরকে তুলে নেবে, নামিয়ে দেবে সাবমেরিনে। চিনুকের ফিরে আসার দরকার নেই, সাগরে ডুবিয়ে দিয়ো ওটাকে। তবে ওই চিনুক নিয়ে একটা সমস্যা আছে। সেটা পরে ব্যাখ্যা করছি...'

ফারাজির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'মাত্র দু'দিনের মধ্যে এত সব প্রস্তুতি কিভাবে নিলে তোমরা?'

এতক্ষণে ফারাজির দৃষ্টিও ধারাল হলো। 'সেটা তোমার কোন মাথাব্যথা নয়, রানা। তুমি পুরনো বন্ধু, তাই উত্তরটা দিচ্ছি। আমাদের এই প্ল্যান আজকের নয়, কয়েক মাস আগের। এতদিন উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। তুমিই আমাদের সেই উপযুক্ত সুযোগ। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি আমাদের জন্যে একটা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছ। আমরা অকৃতজ্ঞ নই, রানা—আমাদের এই কাজটা করে দেয়ার বিনিময়ে তুমি কি পেলে খুশি হবে বলো।'

'কাজটা যদি করি, আমাকে কিছু দিতে হবে না,' বলল রানা। 'তুমি শুধু খরচের টাকাটা দেবে।'

'সেটা কত হতে পারে?'

'এখুনি বলতে পারছি না। দক্ষ মার্সেনারি কম টাকায় কাজ করে না।

ইকুইপমেন্ট কিনতেও অনেক টাকা লাগবে। পরে তোমাকে জানাব।' তারপর জানতে চাইল, 'সাবমেরিনটা কি ধরনের?'

'এটাও তোমার অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন ফারাজি।

'আমার কোন প্রশ্নই অপ্রাসঙ্গিক নয়,' রাগ চেপে বলল রানা। 'জাহাজটা হাইজ্যাক করার পর ইসরায়েলি গানবোট ধাওয়া করতে পারে আমাদের। এমন কি দিয়াগো গার্সিয়া থেকে মার্কিন ডেস্ট্রয়ারও ছুটে আসতে পারে। একটা মিসাইল নিয়ে চিনুকে উঠলাম, তারপর যদি ইউ.এস. বা ইসরায়েলি এয়ারফোর্সের জেট ফাইটারগুলো পিছু নেয়?' কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ফারাজি, হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিল রানা। 'এমন কি সাবমেরিনে ওঠার পরও বিপদ কাটবে না–সবাই জানে, ওদিকে অনেক দেশেরই নিউক্লিয়ার সাবমেরিন আছে। ধাওয়া করে যদি ধরে ফেলে, বা ডেস্ট্রয়ার থেকে টর্পেডো ছোঁড়ে?'

রানা থামার পরও চুপ করে থাকলেন ফারাজি।

'তুমি সব কথা আমাকে বলছ না, ফারাজি,' অভিযোগ করল রানা। 'আমার জানামতে তোমাদের যে দু'একটা সাবমেরিন আছে, সবই পুরানো, আয়ু প্রায় শেষ হয়ে আসার পর রাশিয়ানরা তোমাদের কাছে বিক্রি করেছে। এ-ধরনের একটা সাবমেরিনে আমি নিশ্চয়ই নিরাপদ বোধ করব না।'

দীর্ঘ আধ মিনিট রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর ফারাজি বললেন, গলা খাদে নামিয়ে, 'এটা আমাদের একটা রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য, রানা। আমি তোমাকে শুধু এই নিশ্চয়তা দিতে পারি, সাবমেরিনটা পুরনো নয়, এটায় ওঠার পর তোমাদের নিরাপত্তা এতটুকু বিঘ্নিত হবে না। আর কিছু জানতে চেয়ো না, প্লীজ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'সব তথ্য পেতে হবে আমাকে, তা না হলে কাজটা আমি নেব কিনা তা বিবেচনা করে দেখতেও রাজি নই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ফারাজি। 'সাবমেরিনে ওঠার পর দেখতেই তো পাবে ওটা কি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমাকে আগেই সব জানতে হবে।'

'ওটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন, রানা,' ধীরে ধীরে বললেন ফারাজি। 'কোত্থেকে পেলাম, কে দিল, এ-সব জানতে চেয়ো না, প্লীজ।'

মনে মনে একটা ধাক্কা খেলো রানা, তবে চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না। লিবীয়ার নৌবাহিনীতে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন আছে, এটা অবিশ্বাস্য একটা তথ্য। 'এবার অন্য প্রসঙ্গ। কাজটা নিজেরা না করে আমাকে দিয়ে কেন করাতে চাইছ তোমরা?'

'ইয়েমেনে আমাদের প্রচুর স্পাই আছে, কিন্তু কেউ তারা দক্ষ যোদ্ধা নয়,' বললেন ফারাজি। 'আমেরিকানরা আন্ডারগ্রাউন্ডে চর ছড়িয়ে রেখেছে, মার্সেনারি ভাড়া করতে গেলে খবরটা চাপা থাকবে না। দক্ষ লোকের অভাব, তাই তোমার মত কাউকে পাবার অপেক্ষায় ছিলাম।'

রানা এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারল না। ফারাজির ব্যাখ্যা আংশিক সত্য। সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হবার পর লিবীয়া সমস্যাতেই আছে। কিন্তু এই কাজ

নিজেরা করলে যতটা ঝুঁকি, মার্সেনারিদের সাহায্য নিয়ে রানাকে দিয়ে করালেও ততটাই ঝুঁকি। মিশন ব্যর্থ হোক বা সফল হোক, মোসাড ঠিকই তদন্ত শুরু করবে। কাজটা কার প্রস্তাবে কে করেছে, সবই এক সময় জানতে পারবে ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স। এটা ফারাজিও বোঝেন। সব ফাঁস হয়ে গেলে বিপদে পড়বে লিবীয়াই, কারণ লিবিয়া যে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র তার আরেকটা প্রমাণ পেয়ে যাবে আমেরিকা ও জাতিসংঘ। এর পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে। এমন কি আমেরিকা লিবীয়া আক্রমণ করার একটা অজুহাতও পেয়ে যেতে পারে। কাজেই এ-ধরনের ঝুঁকি লিবীয়া নেবে না, অন্তত নেয়ার কথা নয়। তাহলে? সব জেনেশুনে কেন তারা ঝুঁকিটা নিতে যাচ্ছে? বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হলো না, উত্তরটা সহজেই পেয়ে গেল রানা। মিসাইল হাতে পাবার পর রানা ও মার্সেনারিদের ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলবে ফারাজি। মিসাইল চুরির প্রস্তাব কে দিয়েছিল, কাদেরকে দিয়ে কাজটা করানো হয়, সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে ফেলবে সে।

মনের ভাব গোপন রেখে রানা জানতে চাইল, 'আরেকটা প্রশ্ন। সাবমেরিন ক্রুদের পরিচয়?'

'তারা সবাই লিবীয়ান,' জবাব দিলেন ফারাজি, পেশীতে তাঁর ঢিল পড়ল।

'ইসরায়েলিদের জাহাজ ত্যাগ করে হেলিকপ্টারে উঠলাম,' বলল রানা, 'তারপর জাহাজটার কি হবে?'

'আমি যতটুকু আন্দাজ করতে পারি, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওদের সোকোট্রো ন্যাভাল বেস উড়িয়ে দিতে চাও তুমি,' বললেন ফারাজি। 'ওদের মিসাইল ছুঁড়েই কাজটা করতে পারো। তারপর, জাহাজ ত্যাগ করার ঠিক আগে, সীককগুলোর ইনলেট ভালভ খুলে দিয়ো। আধ ঘণ্টার মধ্যে ডুবে যাবে।'

'ক্রুরা?'

'জাহাজের সঙ্গে ক্রুরাও ডুবে মরুক। ভেবে দেখো, ওরা তোমাদের তিনজন এজেন্টকে খুন করেছে, তার বদলে ওদের কমপক্ষে পঁচিশজন ক্রু অফিসারকে খুন করার অধিকার তোমার আছে। কোন সাক্ষী না রাখার জন্যেও এটা দরকার।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন ব্রিগেডিয়ার। 'আর কিছু, ডিয়ার ফ্রেন্ড?'

'আপাতত নয়,' বলল রানা। 'তবে ইসরায়েলিদের জাহাজে আমাদেরকে তোমরা কিভাবে তুলে দেবে, ডিটেলস প্ল্যানটা আমি জানতে চাইব।'

'অবশ্যই। আরও দু'একটা তথ্য পেলেই প্ল্যানটা তৈরি করে ফেলব আমরা।'

'গুড।'

'আমি তাহলে ধরে নিতে পারি, প্রিয় বন্ধু আমার প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করছে না?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলেন ফারাজি।

'তা ধরে নিতে পারো,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা, 'তবে তোমার প্রিয় বন্ধুর ধারণা তুমি তাকে সব কথা বলোনি, অনেক কিছুই গোপন করে গেছ। কাজেই কিছু তথ্য গোপন রাখার অধিকার তারও থাকল। চিনুক সম্পর্কে কি যেন একটা সমস্যা আছে বলছিলে।'

হেসে ফেললেন ব্রিগেডিয়ার। 'তুমি একটুও বদলাওনি, রানা। ওমানের সালালাহ্-য় আছে ওটা। কিন্তু আমাদের দু'জন পাইলটই রোড অ্যাক্সিডেন্টে

আহত হয়েছে, ক্লিনিক থেকে ছাড়া পেতে দেরি হবে। বলছিলাম কি, তুমি যদি...'

'নেগাই মেনেমের মাধ্যমেই আবার যোগাযোগ হবে,' জানাল রানা। 'আমার প্রস্তুতি শেষ হলে তাকে আমি খবর দেব। পাইলটের ব্যবস্থা করতে পারি কিনা দেখি। এখান থেকে তুমি আগে বেরোও, দশ মিনিট পর আমি বেরুব।'

'এখন থেকে আমি প্রার্থনা করব মিশনটা য্যাতে সফল হয়,' চেয়ার ছাড়লেন ফারাজি। 'বিদায়, দোস্ত।'

দুই

পরদিন সকাল ন'টায় মেনেমের একটা মেসেজ পেল রানা— 'ব্রিগেডিয়ার আপনার সঙ্গে আবার দেখা করতে চান। জরুরী। আমার তিন নম্বর সেক্স-শপে—ওটা বস এন লুমবারপ্লেইন-এ। সাইনবোর্ডে লেখা আছে, কুকিমুকি। উনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

ট্রাম ধরে বস এন লুমবারপ্লেইনে পৌঁছুল রানা। সকালে সেক্স-শপে খদ্দের নেই। একটা মেয়ে ওকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে এল। কামরায় পায়চারি করছেন ব্রিগেডিয়ার ফারাজি। উত্তেজিত। আড়ষ্ট হাসি হাসলেন। 'মিসাইল সম্পর্কে গ্রীনলাইট পেয়ে গেছি, রানা। কাল ওগুলো প্লেনে করে এডেনে আনা হচ্ছে। বারোটা। কাল থেকে সাতদিন পর, তারমানে এ-মাসের একুশ তারিখে, জিরো-জিরো-থারটি আওয়ারে, ওগুলো নিয়ে এডেন থেকে সোকোট্রার উদ্দেশে রওনা হবে একটা জাহাজ। ওটার নাম গোল্ডামেয়ার, পনেরো হাজার টন স্পারটাক ক্লাস মার্চেন্ট শিপ।'

'জাহাজে আমরা উঠব কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা, চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলল।

নিঃশব্দে হাসলেন ব্রিগেডিয়ার। 'নো প্রবলেম। হাসিমুখে হেঁটে উঠবে। কোনটা কার কেবিন, ইসরায়েলিরা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবে।'

'ব্যাখ্যা করো।'

'এডেন বেস থেকে মিসাইলের সঙ্গে টেকনিশিয়ানদের একটা গ্রুপ যাচ্ছে, ওগুলো সোকোট্রায় ইনস্টল করার জন্যে,' বললেন ব্রিগেডিয়ার। 'ডকে ওরা কখন পৌঁছুবে এখনও তা আমরা জানতে পারিনি, তবে ওখানে তোমরা পৌঁছুনোর আগেই জানতে পারব। ওই টেকনিশিয়ানদের বদলে তোমরা উঠবে গোল্ডামেয়ারে।'

'ক'জন ওরা?'

'বারোজন।'

'জাহাজের ক্রুর সংখ্যা?'

'তেইশজন, দু'জন কমিয়ে বা বাড়িয়ে ধরতে পারো। ইসরায়েলিদের জাহাজে সাধারণত ক্রুর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশিই থাকে।'

'আর কিছু জানতে পারোনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আর কিছু কি?' ফারাজিকে বিস্মিত দেখাল।

'রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি, প্রসিজার: কমিউনিকেইশন কোড, জাহাজের নরম্যাল কোর্স; রনদেভো পয়েন্টের কো-অর্ডিনেটস।'

অভয় দিয়ে হাসলেন ফারাজি। 'এ-সব নিয়ে চিন্তা কোরো না, রানা। তুমি আমস্টারডাম ত্যাগ করার আগেই সব জানতে পারবে।'

'আমাকে তুমি কবে আমস্টারডাম ছাড়তে বলো?'

'আজ থেকে চারদিন পর, শনিবার সকালে,' জবাব দিলেন ব্রিগেডিয়ার।

'তারপর কি ঘটবে, ব্যাখ্যা করো। পুরো প্ল্যানটা আমি শুনতে চাই।'

গড়গড় করে বলে গেলেন ফারাজি। সকাল এগারোটা পাঁচ মিনিটে কেএলএম ফ্লাইট। সন্ধে সাতটা পনেরো মিনিটে দাহরানে ল্যান্ড করবে ওটা। বারোটা সীট বুক করা হয়েছে। আরোহীদের নামগুলো আগেই ফারাজিকে জানিয়ে দেবে রানা। দাহরান থেকে সৌদি এয়ারলাইন্সের একটা চার্টার করা প্লেন ওদেরকে উত্তর ইয়েমেনের তা'ইজ নামে একটা জায়গায় পৌঁছে দেবে। প্লেন টাচডাউন করবে রাত এগারোটা পনেরো মিনিটে। ওখানে একটা ট্রাক অপেক্ষা করবে, ওদেরকে নিয়ে যাবে দার আম ফারশাহ্-য়। জায়গাটা দক্ষিণ ইয়েমেন সীমান্তে। ওখানে আবার লিবীয় স্পাইরা দায়িত্ব নেবে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সব ঠিক আছে। তবে কোডস, রেডিও প্রসিজারস আর কো-অর্ডিনেটস কালকের মধ্যে পেতে হবে আমাকে, তা না হলে মিশন বাতিল হয়ে গেছে বলে ধরে নেব আমি।'

ব্রিগেডিয়ার তাকিয়ে থাকলেন। 'এত তাড়া কিসের, রানা?'

'আমার টীমের লোকজনকে সমস্ত তথ্য জানাতে হবে, রওনা হবার অনেক আগেই। কারণ তারা জানে কোথাও সামান্য একটু ত্রুটি থাকলে সবাই আমরা মারা যাব।'

'ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব তথ্য পেয়ে যাবে তুমি।' একটু থেমে ব্রিগেডিয়ার জানতে চাইলেন, 'খরচের কথাটা এখনও তুমি জানাওনি।'

'মার্সেনারিদের জন্যে ছয় লাখ ডলার ধরে রাখো,' বলল রানা। 'ইকুইপমেন্টের জন্যে আরও তিন লাখ।'

'ইকুইমেন্টের টাকা পুরোটাই আজ পেয়ে যাচ্ছ। মার্সেনারিদের টাকাও, তবে অর্ধেক। বাকিটা কাজ শেষ হলে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর বলল, 'এবার অন্য একটা জরুরী প্রসঙ্গ।'

'বলো,' সতর্ক দেখাল ব্রিগেডিয়ারকে।

'মিশন যদি ব্যর্থ হয়, তখন কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমরা যদি মারা যাই? কিংবা বেঁচে থাকলাম, অথচ ক্ষেপণাস্ত্রটা সাবমেরিনে তুলতে পারলাম না? বুঝতেই পারছ, এটা প্রায় একটা ইমপসিবল মিশন।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন ফারাজি। 'কেউ মারা গেলে তিন লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ পাবে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সবাই মারা যাবে ধরে নিয়ে টাকাটা নেগাই মেনেমের

কাছে জমা রাখতে হবে তোমাকে,' বলল ও। 'রাজি?'

'রাজি,' বললেন ব্রিগেডিয়ার, জানেন রানার সঙ্গে তর্ক করে জিততে পারবেন না। 'তবে মিসাইলটা যদি সাবমেরিনে তুলতে ব্যর্থ হও তোমরা, বাকি পাওনা টাকার আশা ত্যাগ করতে হবে। ঠিক আছে?'

'সাবমেরিনের কমান্ডার কে আমি জানি না, ক্রু সম্পর্কেও আমার কোন ধারণা নেই,' বলল রানা। 'ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়াই যদি সাবমেরিনে উঠি, কমান্ডার বা ক্রুরা খেপে উঠবে না তো?'

ফারাজি অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠলেন। 'কি বলতে চাও তুমি?'

'আমাদের বীমা থাকলে ভাল হয়, ফারাজি,' বলল রানা।

'অর্থাৎ?'

'ওই সাবমেরিনে আমার লোকজন থাকলে খুশি হতাম, ফারাজি। ক্রু ও অফিসারের সংখ্যা কমিয়ে অর্ধেক করো, তাদের জায়গা দখল করবে আমার লোকজন?' জোরাল কোন দাবি নয়, হালকা সুরে অনুরোধ করছে রানা। ওর সন্দেহ, মিশন ব্যর্থ হোক বা সফল হোক, মিসাইল চুরির সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার জন্যে সাবমেরিনে ওদেরকে না-ও তোলা হতে পারে। ফারাজির যে গোপন কোনও অভিসন্ধি আছে, এটা পরিষ্কার। কাল রাতেই খবর নিতে গিয়ে জানতে পেরেছে রানা, ওদের চিনুক হেলিকপ্টারের পাইলট দু'জন অ্যাক্সিডেন্ট করেনি, তাদেরকে ছুটি দেয়া হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছিলেন, কোন রকমে নিজেকে সামলে রাখলেন। 'এ তোমার অসম্ভব দাবি, রানা। তোমার এই শর্ত পূরণ করা আমার ক্ষমতার বাইরে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্যাপারটা মেনে নেয়ার ভঙ্গি করল রানা।

পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন ব্রিগেডিয়ার। 'তুমি আগে বেরিয়ে যাও, আমি পরে বেরুব।'

রাত পৌনে দশটায় এজেন্সির আমস্টারডাম শাখার প্রধান জিয়া হাসানকে নিয়ে মেনেমের সেফ-হাউসে পৌঁছুল রানা। ওর হাতে একটা এনভেলাপ ধরিয়ে দিল মেনেম। 'এখানে বিশজনের একটা তালিকা আছে, স্যার। আপনি যাদেরকে চেয়েছিলেন তাদের সবাইকে পাইনি। তবে যাদেরকে পেয়েছি, বাকি লোকগুলো সম্পর্কে তারা সুপারিশ করেছে।'

এনভেলাপটা খুলল রানা। তালিকায় মুনির মোস্তফা, গোলাম বাখারা আর আয়েন জামালুর নাম আছে দেখে স্বস্তিবোধ করল। তিনজনই এরা সাবেক ন্যাভাল অফিসার, পদমর্যাদায় মেরিন এঞ্জিনিয়ার ও ক্যাপটেন ছিল। সালমা শিরিনের নামটাও আছে, খুশি হয়ে উঠল মন। তালিকার বাকি নামগুলোয় চোখ বুলিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর মেনেমকে বলল, 'সব মিলিয়ে দশজন দরকার আমার।' হাতঘড়ি দেখল। 'নামগুলোয় টিক চিহ্ন দিচ্ছি, শুধু ওদেরকে আমার দরকার হবে। বাকি সবাইকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিদায় করে দেবেন, সেই সঙ্গে এনভেলাপে ভরে প্রত্যেককে এক হাজার ডলার দেবেন। নিজেদের কাজ

ফেলে আসার ক্ষতিপূরণ।'

তালিকায় রানা টিক চিহ্ন দেয়ার পর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল মেনেম।

সবাই এসে পৌঁছুতে এখনও আধ ঘণ্টা দেরি আছে। এই সুযোগে পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোন বের করে রানা এজেন্সির মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা শাখা প্রধানের সঙ্গে কথা বলল ও। তাদেরকে জরুরী কয়েকটা নির্দেশ দিল।

তালিকাভুক্ত মার্সেনারিরা সময়মতই পৌঁছুল। দশজন বাদে বাকি সবাইকে একটা করে এনভেলাপ ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করল মেনেম।

দশজনকে নিয়ে বড় একটা কামরায় বসল রানা। যাদের সঙ্গে পরিচয় আছে, সবাই আলিঙ্গন করল ওকে। অন্যেরা হ্যান্ডশেক করল। ব্রিফিং শুরু হলো সাড়ে এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে। প্রথমেই সেফ-হাউসের নিরাপত্তা সম্পর্কে সবাইকে আশ্বস্ত করল রানা। সেক্স-শপের নাম পাল্টে 'অ্যান্টিক'স শপ' করা হয়েছে, উইন্ডো-শোকেসে শোভা পাচ্ছে নানা ধরনের শো পীস। ওরা বসেছে ভেতরের একটা কামরায়, কামরার বাইরে রানা এজেন্সির এজেন্টরা পাহারায় আছে। শপের বাইরেও নজর রাখছে একটা টীম।

কামরার দেয়ালে আগেই অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা ও গালফ অভ এডেন-এর একটা ম্যাপ টাঙানো হয়েছে। কথা বলার সময় পয়েন্টার দিয়ে দু'একটা জায়গার প্রতি মার্সেনারিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা–সৌদি আরবের দাহরান, সোকোট্রা ছাড়িয়ে রনদেভো পয়েন্ট, তারপর এডেন বন্দর–যেখান থেকে গোল্ডামেয়ার রওনা হবে। ব্রিফ করা হলো সংক্ষেপে, সব তথ্য এখুনি সবাইকে জানাবার প্রয়োজন নেই। কথা শেষ হতে কারও কোন প্রশ্ন আছে কিনা জানতে চাইল ও।

'একটা প্রসঙ্গ তুমি তুললেই না,' বলল আবু সাদাত। সরু মুখ, খুলি কামড়ে থাকা কোঁকড়ানো চুল, রানার সঙ্গে জিম্বাবুইয়ে লড়েছে সে। 'অস্ত্র। সেগুলো কি, এবং কখন হাতে পাব?'

'প্রত্যেকে একটা করে উজি আর হ্যান্ডগান পাবে। উজির বদলে শটগানও নিতে পারো। এর বেশি অস্ত্র সঙ্গে রাখা সম্ভব নয়। ওগুলো আমরা হাতে পাব দাহরানে পৌঁছানোর পর। শিরিন আর হাসানের প্যাকেজে অ্যাকুয়ালাঙ আর লিমপেট মাইনও থাকবে।' হাসানের সঙ্গে আর কি থাকবে, সেটা গোপন রাখল ও।

চেহারা দেখে মনে হয় পাষাণ, নাম দিল নওশাদ, একটা হাত তুলল। তারও আফগানিস্তানে রানার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। নওশাদকে না-ও পাওয়া যেতে পারে, এ-কথা ভেবেই তালিকায় সালমা শিরিনের নামটা রেখেছিল রানা। দু'জনকেই পাওয়া গেছে শুনে প্রথমে দ্বিধায় পড়ে যায় ও। নওশাদ কমিউনিকেইশন ইকুইপমেন্ট সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, তাকে বাদ দেয়া চলে না। ইসরায়েলি মিসাইল টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে একজন মহিলা রেডিও অপারেটর থাকবে, কাজেই শিরিনকেও বাদ দেওয়ার উপায় নেই। তাছাড়া, শিরিন ভাল ডাইভার হওয়ায় তাকে রানার অন্য কাজেও দরকার হবে। শেষ পর্যন্ত দু'জনকেই দলে রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। নওশাদকে হাত তুলতে দেখে তার দিকে

তাকাল রানা।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইসরায়েলি মার্চেন্ট মেরিন কোডস, সেই সঙ্গে রেডিও প্রসিজারস সম্পর্কে ডিটেইল্‌স্ জানতে চাই আমি,' বলল নওশাদ।

'এই পেলে,' বলে পকেট থেকে মোটা একটা এনভেলাপ বের করে তার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। এনভেলাপটা আজ বিকেলে মেনেমের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার ফারাজি। এনভেলাপে রনদেভোর কো-অর্ডিনেটস উল্লেখ করা হয়েছে।

সবার কাছ থেকে একটু দূরে বসেছে মধ্যবয়স্ক মুনির মোস্তফা, ঘন ভুরুর ভেতর চোখ দুটোকে প্রায় দেখাই যায় না। মিশরীয় নৌ-বাহিনীতে ক্যাপটেন ছিল, যে-কোন কারণেই হোক চাকরিটা হারায়। গোল্ডামেয়ারের ক্যাপটেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে তাকে। রানার সঙ্গে পরিচয় আছে, তবে একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই। এই মুহূর্তে সে একটা মেরিটাইম চার্ট পরীক্ষা করছে একাগ্রচিত্তে, কামরার আর কারও উপস্থিতি সম্পর্কে যেন সচেতন নয়।

আরেকজন হাত তুলল। 'আমি গোলাম বাখারা, সৌদি নেভীর সাবেক এঞ্জিনিয়ারিং অফিসার। কমান্ডিং অফিসারকে চড় মারায় আমার কোর্ট-মার্শাল হয়েছিল। অন্য কোথাও কাজ না পেয়ে মার্সেনারিদের খাতায় নাম লিখিয়েছি। বায়োগ্রাফির এখানেই সমাপ্তি।'

'বাখারা,' শান্ত গলায় বলল রানা, 'তোমার কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারো।'

'আমাকে যদি এঞ্জিন নিয়ে কাজ করতে হয়, আমার একজন সহকারী লাগবে,' বলল বাখারা।

'তোমার পাশেই বসে আছে, আয়েন জামালু।'

'কোয়ালিফিকেশন?' জেরার সুরে জিজ্ঞেস করল বাখারা–রানাকে নয়, আয়েন জামালুকে।

'আমি আলজিরিয়ান। আব্বা একটা বার্জের স্কিপার ছিলেন, ওই বার্জেই আমার জন্ম। জাহাজ মাস্টারের সার্টিফিকেট আছে।' আয়েন জামালু কটমট করে তাকিয়ে আছে বাখারার দিকে।

বাখারা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। রানা সিদ্ধান্ত নিল, এই দু'জনের ওপর নজর রাখতে হবে ওকে।

রানা কিছু বলেনি, জিয়া হাসান নিজেই দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এল। সবার ওপর ঠাণ্ডা দৃষ্টি বোলাল একবার। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে শুরু করল, 'আমি জিয়া হাসান, রানা এজেন্সি। এই অপারেশনে আমি সেকেন্ড-ইন-কমান্ড।' কার কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে আরেকবার দেখে নিল সবাইকে। সন্তুষ্টবোধ করল, কারণ প্রত্যেকের মনোযোগ নিজের দিকে ফেরাতে পেরেছে, এমন কি মুনির মোস্তফাও চার্ট থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'তোমরা কেউ এর আগে আমার সঙ্গে কাজ করোনি। কাজেই নিজের সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি।

'প্রথম কথা, আমার দাবি নিঃশর্ত আনুগত্য। আমি যখন কোন নির্দেশ দেব, সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তা পালন করবে, কোন প্রশ্ন ছাড়াই। উপস্থিত কেউ যদি

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হও, তার জন্যে তিক্ত বিস্ময় অপেক্ষা করছে। দ্বিতীয় কথা, ভুল বা অজুহাত আমি অ্যাকসেপ্ট করব না। প্রত্যেকে যে যার দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করার ওপর নির্ভর করবে আমাদের সবার জীবন। পরিষ্কার?'

কেউ কথা বলল না। বোধহয় নিঃশ্বাস ফেলতেও দ্বিধায় ভুগছে।

'এবার জাহাজটার কথা,' বলল হাসান। 'এডেন থেকে ওটা জিরো-জিরো-থারটি আওয়ারে রওনা হবে। জিরো-থ্রী-থারটি আওয়ারে অ্যাকশন শুরু করব আমরা। প্রাথমিক অবজেকটিভ চারটে–ব্রিজ, রেডিও রূম, এঞ্জিনরূম আর ক্রু। প্রতিটি কাজ একই সঙ্গে সারতে হবে। ভুল করার কোন অবকাশ নেই। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার আগে প্রত্যেকে তোমরা জাহাজের একটা প্ল্যান পাবে, তাতে চিহ্ন দেয়া আছে কখন কোথায় কাকে কি দায়িত্ব পালন করতে হবে বা কোন পজিশন নিতে হবে। প্ল্যানটা মনে গেঁথে নেয়ার পর পুড়িয়ে ফেলো। আরেকটা কথা। তোমাদের সবার হিব্রু শুদ্ধ নয়। কাজেই একান্ত বাধ্য না হলে মুখ না খোলাই ভাল। কথা বলার অবাধ অনুমতি থাকবে শুধু পাঁচজনের–মুনির মোস্তফা, দিল নওশাদ, গোলাম বাখারা, শিরিন, আমার ও জানশেরের।

সৈয়দ জানশের নড়েচড়ে বসল। সে সোমালিয়ান, সোমালিয়ান নৌ-বাহিনীতে ফার্স্ট অফিসার ছিল। জাহাজ হাইজ্যাক করার পর মুনির মোস্তফার সহকারী হিসেবে কাজ করবে সে।

'কোন প্রশ্ন? নেই? তাহলে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।' দরজার কাছে, নিজের জায়গায় ফিরে গেল জিয়া হাসান।

জানশেরের দিকে হাত তুলল রানা। 'সিকিউরিটি স্কোয়াড,' বলল ও। 'তোমার দায়িত্ব। চারজনকে পাচ্ছ–সালমা শিরিন, শেখ সোলায়মান, বিন জুবায়ের, সালভিক রাহমানভ। কাজটা সহজ হবে না, তবু আমি ইসরায়েলি ক্রু-অফিসারদের পুরোপুরি অসহায় অবস্থায় দেখতে চাই। কাজেই যা করার সবই করবে তোমরা।' গার্ডরা সবাই ভাড়াটে খুনী; সে-কথা মনে রেখেই শেষ কথাটা বলল রানা, 'তবে, প্রয়োজন না হলে রক্তপাত এড়িয়ে যাব আমরা। শিরিনকে স্পাই হিসেবে কাজে লাগাবে–জাহাজের সব জায়গায় ঘুরে বেড়াবে ও।'

রানা ভেবেছিল আর কেউ প্রশ্ন করবে না, কিন্তু চার্ট থেকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল মুনির মোস্তফা। 'ভাই, রানা, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রসঙ্গ।'

'হ্যাঁ, বলো, মোস্তফা,' উৎসাহ দিল রানা।

'গোল্ডামেয়ারের ক্রু ও অফিসারদের সামলানো তেমন কঠিন কাজ নয়,' বলল মোস্তফা। 'কিন্তু ওরা ছাড়াও এক কি দু'জন লোক থাকবে জাহাজে, তাদেরকে নিয়েই আমার সবচেয়ে বেশি ভয়। আমি মোসাড এজেন্টদের কথা বলছি। ইদানীং প্রতিটি ইসরায়েলি জাহাজে একজন করে থাকে। সাধারণত একজন সহকারী সহ। ওরা সত্যিকার বিপদ, রানা। ওদেরকে প্রথম সুযোগেই খতম করা দরকার।'

সৈয়দ সাফাত নিজের গলায় ছুরি চালাবার অভিনয় করল, বলল, 'এটা কোন সমস্যাই নয়, ক্যাপটেন। জবাই করে রশিতে বাঁধব, ফেলে দেব পানিতে–হাঙরগুলো খুশি হবে।'

'ব্যাপারটা এতই সহজ ভেবেছ?' জিজ্ঞেস করল মোস্তফা। 'চিনবে কিভাবে যে জবাই করবে? ক্রু বা অফিসারদের ভেতর থাকতে পারে তারা—সেইলর, গ্রিজার, ডেক অফিসার, অর্থাৎ যে-কোন ছদ্মবেশে। ওদেরকে তোমার নিজের চেষ্টায় খুঁজে বের করতে হবে। ইসরায়েলি ক্রু বা অফিসাররা ওদেরকে এত ভয় পায়, যতই টরচার করো, ওরা তাদের নাম মুখে আনবে না...'

আবু সাদাত দাঁড়াল। 'এই সমস্যার একটাই সমাধান,' বলল সে। 'জাহাজ হাইজ্যাক করার পর ডেকে ক্রুদের লাইন দিয়ে দাঁড় করাব...' কথা শেষ না করে মেশিন গান চালাবার ভঙ্গি করল সে।

চাবুকের মত সপাং করে উঠল রানার গলা, 'না!'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

হাসান ছাড়া উপস্থিত বাকি সবাই জানে লিবীয়ার জন্যে একটা মিসাইল হাইজ্যাক করা হবে। সোকোট্রা দ্বীপের ইসরায়েলি ন্যাভাল বেস উড়িয়ে দেয়ার প্ল্যানটা ওদের কাউকে রানা জানায়নি, একান্ত প্রয়োজন না হলে জানাবেও না। শুধু এই কারণে গোল্ডামেয়ারের ইসরায়েলি ক্রুদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, ওরা সবাই হেলিকপ্টারে চড়ে কেটে পড়ার পরও।

কাঁধ ঝাঁকাল আবু সাদাত। রানাকে বলল, 'দোস্ত, ভুল করে থাকলে মাফ চাই!' বিমূঢ় দেখাল তাকে।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল রানা। 'ব্রিফিং শেষ।' ওর খেয়াল আছে, একজন বাদে সবাই কোন না কোন প্রশ্ন করেছে। সেই একজন হলো সালমা শিরিন। ট্রাউজার আর শার্ট, বুট আর হ্যাট পরে থাকায় তাকে অবশ্য মেয়ে বলে চেনার উপায় নেই। 'একজন-দু'জন করে বেরিয়ে যাও তোমরা। হাসান তোমাদেরকে একটা করে এনভেলাপ দেবে। ভেতরে খরচার টাকা, এয়ারলাইন টিকেট আর গোল্ডামেয়ারের নকশা আছে। শনিবারের আগেই নতুন পাসপোর্ট পেয়ে যাবে সবাই। মাঝখানের সময়টা সাবধানে থাকবে। শনিবার সকালে, ইলেভেন-জিরো-ফাইভে টেক অফ করবে প্লেন। সময় মত পৌঁছুতে হবে সবাইকে।'

একে একে বেরিয়ে গেল সবাই, তাদের পিছু নিয়ে হাসানও। কামরায় এখন শুধু রানা আর শিরিন।

'তুমি কিছু জানতে চাওনি,' নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা।

'জানার কিছু নেই, ভাই,' অপরূপ চাঁদমুখে সরল হাসি, চোখে কৌতুকের ঝিলিক। 'আপনি আমার আদর্শপুরুষ, মাসুদ ভাই। ডেকেছেন, সেজন্যে আমি ধন্য। ভাগ্যকেও ধন্যবাদ দিতে হয়, আমস্টারডামে ছিলাম।'

একটু আড়ষ্টবোধ করল রানা। কোন মেয়ে ভালবাসলে সেটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারে ও। কিন্তু ওকে আদর্শচরিত্র ধরে নিয়ে কেউ যদি ভক্তিতে গদগদ হয়ে পূজনীয় ভাবতে শুরু করে, বিব্রত না হয়ে পারে না। শিরিনের সঙ্গে অনেক দিন পরপর হঠাৎ দেখা হয় ওর, যখনই দেখা হয় কিছু না কিছু ওকে প্রেজেন্ট করে মেয়েটা, এবং সেই সঙ্গে এমন ভাব দেখায় রানাকে যেন সে দেবতার আসনে বসিয়ে রেখেছে। ব্যাপারটা রানার মনে এক ধরনের হতাশাও,

সৃষ্টি করে। দেশে-বিদেশে বহু মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ওর, অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও জন্মায়, কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর হতে চলল কাউকে ভালবাসতে ইচ্ছে করেনি ওর। একমাত্র ব্যতিক্রম সালমা শিরিন।

এত মেয়ে থাকতে শিরিনকে ওর কেন ভালবাসতে ইচ্ছে করল, এর কোনও ব্যাখ্যা রানা দিতে পারবে না। মেয়েটা অসাধারণ সুন্দরী, তবে সেটাই কারণ নয়। গেরিলা ফাইটের ট্রেনিং নেয়া সত্ত্বেও শিরিনের মধ্যে কমনীয়তা, কোমলতা, নারীসুলভ আকর্ষণ, সরলতা ইত্যাদি সমস্ত ঐশ্বর্যই অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু এগুলোও তাকে ভালবাসতে চাওয়ার কারণ নয়। এত সব গুণ থাকায় বিশ্বাস করা কঠিন যে শিরিন পেশায় একজন গেরিলা, ওঅর-করিসপনডেন্স আসলে ওর কাভার। জর্দান, লেবানন আর ইসরায়েলি সীমান্তে দায়িত্ব পালন করে সে, প্রতি পদে যেখানে মৃত্যুর আশঙ্কা। পেশার প্রতি শিরিনের নিষ্ঠা বিস্মিত করে রানাকে। হিযবুল্লাহ গেরিলাদের সঙ্গে যখন হামলা কাভার করতে যায়, দেখে মনে হবে পিকনিক করতে যাচ্ছে। ক্যামেরায় চোখ রেখে যখন গোলাগুলির ছবি তোলে, এতটুকু নার্ভাস হতে দেখা যায় না। বহু বছর আগে স্বদেশী একটা মেয়েকে ভালবেসেছিল রানা, তার সঙ্গে শিরিনের চেহারা খানিকটা মেলে। ভালবেসেছিল, পেয়েও ছিল, কিন্তু তারপর ব্যাখ্যাতীত জটিল কি সব কারণে মেয়েটা ওর জীবন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, অথচ আজও তার কথা রানা ভুলতে পারে না। সেই ভুলতে না পারাটাই কি শিরিনকে ভালবাসতে চাওয়ার কারণ?

রানার নিজেরও তা জানা নেই।

'কি ভাবছেন, মাসুদ ভাই?' চেয়ার ছেড়ে উঠে এল শিরিন। 'আমি কি আপনাকে বিব্রত করছি?'

'না। নাহ্!' তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল রানা। 'কেমন আছ বললে না তো? আমস্টারডামে কি করছিলে?'

'বললে বিশ্বাস করবেন?' হঠাৎ হেসে উঠল শিরিন।

'বলো, কেন বিশ্বাস করব না!'

'যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে এখানে আমি আপনার জন্যেই এসেছিলাম,' বলল শিরিন। 'আপনার সঙ্গে দেখা হবে, সে আশায় নয়। আপনার জন্যে একটা রোলেক্স কিনতে।'

'হোয়াট?'

'আমার অনেক দিনের শখ, আপনাকে একটা রোলেক্স রিস্টওয়াচ প্রেজেন্ট করি,' অদ্ভুত হেসে বলল শিরিন। 'জর্দানে ছিলাম, শুনলাম এখানে রোলেক্সের একটা প্রদর্শনী হচ্ছে, কিনলে ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে। তাই চলে এলাম। ভাগ্যটা এতই ভাল, ঘড়িটা যেদিন কিনলাম সেদিনই খবর পেলাম আপনি আমাকে খুঁজছেন। অবাক কাণ্ড, তাই না?'

'দেখা হলেই আমাকে কিছু প্রেজেন্ট করবে, তুমি বুঝতে পারো না ব্যাপারটা আমাকে কি রকম বিব্রত করে?' নরম সুরে বলল রানা।

'তাহলে বলে দিন অন্য আর কি উপায় আছে আপনার ঋণ শোধ করার?' শিরিনের গলায় প্রায় চ্যালেঞ্জের সুর।

'ঋণ?' রানা বিস্মিত। 'কিসের ঋণ?'

'ইসরায়েলি সীমান্ত চৌকিতে তিনদিন বন্দী ছিলাম। ওরা আমাকে মেরেই ফেলত। মনে নেই? হিযবুল্লাহ গেরিলাদের নিয়ে চৌকিটায় কে হামলা চালায়? কে আমাকে উদ্ধার করে আনে?'

'আরে ধ্যাত্‌! তুমি তাহলে কিছুই জানো না। তুমি রিপোর্টার, এ-কথা জানার পর ইসরায়েলিরা তোমাকে ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, আমরা হামলা না করলেও চলত। কাজেই আমার কাছে কোন ভাবেই তুমি ঋণী নও।'

'থাক, অত বিনয় দেখাতে হবে না! আমি যেন কচি খুকি, রূপ-কথা শুনিয়ে ভোলাচ্ছেন! ছেড়ে দিত, না? ফায়ারিং স্কোয়াড গুলি করার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, এই সময় আপনারা পৌঁছান, সে-খবর রাখেন?'

'আচ্ছা, এ-সব কথা থাক—কেমন আছ তাই বলো।'

হাতব্যাগ খুলে মখমল দিয়ে মোড়া ছোট্ট একটা বাক্স বের করল শিরিন। 'আপনাকে একটা সুখবর দিই,' বলে সলজ্জ একটু হাসল। 'তার আগে হাতের ঘড়িটা খুলে ফেলুন, এখন থেকে আপনাকে আমার প্রেজেন্ট করা ঘড়ি পরতে হবে।' অনুমতির অপেক্ষায় থাকার মেয়ে নয় সে, নিজেই আরও এক পা এগিয়ে এসে রানার সামনে চলে এল, খুলে ফেলল ওর রিস্টওয়াচ, তারপর বাক্স থেকে সোনালি রঙের রোলেক্সটা পরিয়ে দিল কব্জিতে। 'কি, মানায়নি?'

কি বলবে বুঝতে পারছে না রানা। জিজ্ঞেস করল, 'সুখবরটা কি?'

'আপনি খুশি হবেন, আমি জানি,' বলল শিরিন, চোখ-মুখ থেকে উজ্জ্বল আভা ছড়াচ্ছে। 'আমি একটা ছেলের প্রেমে পড়েছি। ছেলেটা ফরাসী মুসলমান, নাম লুঁয়ে জাদিব। বিয়ের তারিখ এখনও ঠিক হয়নি...'

'এবার কাজের কথা, শিরিন,' বাধা দিল রানা, কি এক হতাশায় রীতিমত মুষড়ে পড়ার অবস্থা ওর।

'মাসুদ ভাই! এরকম একটা খবর...আপনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন না?'

'কংগ্রাচুলেশনস,' বিড়বিড় করল রানা, নিজেকে মনে করিয়ে দিল এখন থেকে শিরিনের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে ওকে।

'আপনি মনে হচ্ছে খুশি হননি?' জিজ্ঞেস করল শিরিন, চেহারা ম্লান হয়ে গেছে। 'কি ব্যাপার, মাসুদ ভাই?'

'দূর বোকা, খুশি হব না কেন! কি ভয়ঙ্কর একটা মিশনে যাচ্ছি, ভেবে দেখেছ? এই অপারেশন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারছি না। দুঃখিত...'

'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি,' কিছুটা অভিমানের সুরে বলল শিরিন। 'তাহলে কাজের কথাই বলুন। গোন্ডামেয়ারে আমার কাজটা কি হবে?'

রানা বুঝিয়ে দিতে শুরু করল, তবে শিরিনের দিকে খুব কমই তাকাচ্ছে।

তিন

কেএলএম ডেস্কে দীর্ঘ লাইন। শেখ সোলায়মানের পিছনে দাঁড়াল রানা, তবে সে

একবার ভুলেও রানার দিকে তাকাল না। লাইনের মাথায় রয়েছে সৈয়দ সাফাত, রানা ও সোলায়মানকে সে দেখতে পেলেও চিনতে না পারার ভানে কোন খুঁত থাকল না। যে যার টিকেট নিয়ে চলে যাচ্ছে।

টিকেট হাতে পাবার পর একটা ফোন বুদে ঢুকল রানা। নেগাই মেনেম জানাল ওকে, ব্রিগেডিয়ার ফারাজি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সব টাকাই পাঠিয়ে দিয়েছেন তার কাছে।

ফ্লাইটটা ঘটনাবিহীন, ভিডিওর ছবি দেখার উপযুক্ত নয়, স্টুয়ার্ডকে ডেকেও পাওয়া গেল না, পরিবেশিত খাবারের মান ভাল নয়। আকাশ পথে সময়টা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিল রানা। দাহরানে পৌঁছে বাকি আরোহীদের সঙ্গে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন ঝামেলা সারতে হলো ওদেরকে। অ্যারাইভাল হলে কোঁচকানো লিনেনের সুট পরা ছিপছিপে এক আরব অপেক্ষা করছে। 'আমাকে ব্রিগেডিয়ার পাঠিয়েছেন, মি. রানা, স্যার। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, প্লীজ।'

বাইরে বেরিয়ে এসে একটা মিনিবাসে চড়ল ওরা। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে মেইন রোড ধরল আরব তরুণ। কয়েকশো গজ এগোবার পর বাঁক নিয়ে ছোট একটা রাস্তায় ঢুকল গাড়ি, কাঁটাতারের বেড়ার পাশ ঘেঁষে যাচ্ছে, বেড়ার ওপারে এয়ারপোর্ট। খানিকদূর যেতেই খোলা একটা গেট, কোন পাহারা নেই। ভেতরে ঢুকে চওড়া কংক্রিট অ্যাপ্রন ধরে ছুটল মিনিবাস, থামল একটা সিওয়ানথারটি ফ্রেইটার প্লেনের পাশে। ওভারহেড লাইটিং-এর অল্প আলোয় দেখা গেল ওভার-অল পরা গ্রাউন্ড ক্রুরা প্লেনটাকে ঘিরে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে ব্যস্ত।

সিওয়ানথারটি-র ভেতরটা যেন বিশাল এক গুহা, মেঝের বেশিরভাগই দখল করে রেখেছে কাঠের বাক্স। প্লেনটা চার্টার করা হয়েছে সৌদি আর্মির নামে, বলা হয়েছে উত্তর ইয়েমেন আর্মির জন্যে মিলিটারি সাপ্লাই যাবে। দক্ষিণ ইয়েমেনের আততায়ীরা উত্তর ইয়েমেনের প্রেসিডেন্টকে খুন করার পর থেকে সৌদি আরব উত্তর ইয়েমেনের মিত্র হয়ে উঠেছে, আর এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে ভুয়া কাগজ-পত্রের সাহায্যে প্লেনটা সৌদি আর্মির নামে চার্টার করতে পেরেছেন ব্রিগেডিয়ার ফারাজি। সৌদি আরবেও তাঁদের স্পাই নেটওঅর্ক অত্যন্ত শক্তিশালী, বাদশাহী মহলের একটা গ্রুপ লিবীয়াকে নানাভাবে সহায়তাও দিয়ে থাকে। ফ্লাইট ডেকের কাছাকাছি ভাঙাচোরা সীটে গা এলিয়ে দিয়ে টীমটা যতটুকু পারা যায় বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করছে। যাত্রাপথে খুশি হবার মত মাত্র একটা ঘটনা ঘটল, ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার কফি আর বিস্কিট পরিবেশন করল।

বিপরীতমুখী বাতাসের গতি বেড়ে যাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে আধ ঘণ্টা পর তা'ইজ এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল ওরা। এয়ারফিল্ডে দাঁড়িয়ে শীতে হি-হি করছে ওরা। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পাঁচ টনী ফোর্ড অন্ধকার ফুঁড়ে ছুটে এল। ড্রাইভিং ক্যাব থেকে লাফ দিয়ে নামল দু'জন তরুণ আরব—একজন ট্রাকের পিছনের টেইল-গেট নামাল, আরেকজন ইশারায় তাড়াতাড়ি ট্রাকে উঠতে বলল ওদেরকে।

দিল নওশাদ, কমিউনিকেইশন ইকুইপমেন্ট এক্সপার্ট, রানার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল। 'চমৎকার, কি বলো? মানুষ যখন মানুষ বানাতে যাচ্ছে, আমরা

পড়লাম বোবা একজোড়া আবদুলের হাতে।'

'কথা কম কাজ বেশি,' বলল রানা। 'ব্রিগেডিয়ারের দক্ষতার প্রশংসা করতেই হয়।'

তা'ইজ-এর দক্ষিণ দিকে পাহাড়, সেই সারি সারি পাহাড় টপকে দীর্ঘ যাত্রা শুরু হলো, হাড়কাঁপানো ঝাঁকি খেতে খেতে সবারই দম ফুরিয়ে এল। ট্রাক যত ওপরে উঠছে শীত ততই পেয়ে বসছে। তিন ঘণ্টা যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে অবশেষে থামল ফোর্ড। আরব তরুণ দু'জন আবার উদয় হলো পিছনে, ইশারায় নামতে বলছে ওদেরকে। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে, ট্রাক থেকে নামার সময় সাদাতকে সোলায়মান বলল, 'আমার কিছু একটা ভেঙেছে। প্রথম সুযোগেই আমি মামলা করব।'

সাদাত বলল, 'তা কোরো, তবে হাসপাতালে ভর্তি হতে চেয়ো না। এদিকে কুষ্ঠ রোগী এত বেশি; শুনেছি রোগী পেলেই ডাক্তাররা প্রথমে ওই রোগের ওষুধ খাইয়ে দেয়।'

কিছু দূর হাঁটার পর একটা উঁচু দালানের আভাস পাওয়া গেল। কাছাকাছি আসতে দালান নয়, প্রাচীন কোন দুর্গের অবশিষ্টাংশ দেখতে পেল ওরা। প্রাচীর আছে, তবে মাথা নেই। একজোড়া টাওয়ার দেখা গেল, চূড়া নেই। 'আমি ভেবেছিলাম ফাইভ স্টার কোন হোটেলে তোলা হবে,' কৌতুক করল সালভিক রাহমানভ।

গাইডরা ওদেরকে পথ দেখিয়ে দুর্গের এক পাশে নিয়ে এল। সামনে কাঠের একটা দরজা, কড়া ধরে তিন বার ঠক-ঠক করল একজন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক লোক। 'ঢুকুন! জলদি!' ফিসফিস করল সে।

দরজা পেরিয়ে অন্ধকারে পা রাখল ওরা। লোকটা দরজা বন্ধ করে দেশলাই জ্বালল, জ্বলন্ত কাঠির ছোঁয়া পেয়ে উজ্জ্বল আলো ছড়াল একটা অয়েল ল্যাম্প। 'আমার পিছু নিন,' সবার সামনে চলে এসে বলল সে। 'সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় সাবধান, কয়েকটা ধাপ ভাঙা।'

'এখানকার ডাক্তার আর হাসপাতালের কথা ভুলো না,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে সোলায়মানকে বলল সাদাত।

প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় পৌঁছুল ওরা। কামরাটা বড়ই, মাটির তৈরি দেয়াল, ছাদ একদিকে কাত হয়ে আছে। কামরার মাঝখানে একজোড়া হ্যারিকেন জ্বলছে, এক কোণে একটা স্টোভ। হলুদ একটা টেবিলও রয়েছে।

আরব লোকটা মুখ থেকে আলখেল্লার একটা অংশ সরাতে চেহারাটা দেখা গেল। কালো পাথরের মত চকচক করছে চোখ দুটো, মুখে কালো দাড়ি, পায়ে ইউএস আর্মির একজোড়া কমব্যাট বুট, আলখেল্লার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে .৩৮ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, নিতম্বে বাঁধা হোলস্টারে গোঁজা। 'এই জায়গা সম্পূর্ণ নিরাপদ,' ওদেরকে আশ্বস্ত করল সে। 'কাল রাতে আপনাদেরকে আমি দক্ষিণ ইয়েমেনে নিয়ে যাব।' কামরার দ্বিতীয় দরজার দিকে হাত তুলল। 'ওদিকে বিছানা আর কম্বল পাবেন। কল নেই, পানি রাখা আছে ড্রামে। তবে ল্যাট্রিন আছে। খাবার পানি পাবেন চামড়ার বেলুনে। আপনাদের জন্য একটা ছাগল জবাই করে

রাঁধা আছে, সঙ্গে আটার রুটি।' একটু থেমে আবার শুরু করল, 'দিনের বেলা ভুলেও বাইরে বেরুবেন না। দক্ষিণ আর পুব পাহাড়ে দক্ষিণ ইয়েমেনি স্নাইপাররা সারাক্ষণ এদিকে তাকিয়ে থাকে।'

'তোমরা ক'জন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ট্রাক এঞ্জিনের ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এল ওদের কানে। শব্দটা দূরে মিলিয়ে যেতে লোকটা বলল, 'শুধু আমি থাকছি।' দরজার দিকে এগোল সে। 'কাল রাতের জন্যে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে আমাকে। কাল আমি সূর্য ডোবার পর আসব। যতটা পারেন বিশ্রাম নিন। আমাদের গন্তব্য অনেক দূরের পথ।' চলে গেল সে।

'সত্যি কাজের লোক,' কেউ একজন মন্তব্য করল।

পরদিন সন্ধ্যা হতেই ফিরে এল লোকটা। ইতিমধ্যে ওরা তৈরি হয়ে নিয়েছে। সবার পরনে কালো পোশাক, রাবার সোল লাগানো বুট। হ্যান্ডগান ছাড়াও প্রত্যেকের কাছে একটা করে উজি। টীমের সবাইকে খুঁটিয়ে দেখল লোকটা। তারপর হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'যাবার সময় হয়েছে।'

এক লাইনে তার পিছু নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রানার নির্দেশে লাইন ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল সবাই, পরস্পরের কাছ থেকে আট-দশ হাত দূরে থাকল। জমিন উঁচু-নিচু, তাসত্ত্বেও লোকটা প্রায় ছুটছে। সে গাইড, তার ঠিক পিছনেই রয়েছে রানা। সবার পিছনে রানা এজেন্সির জিয়া হাসান, কাঁধে ভারী একটা রাকস্যাক। রানার পিছনে মুনির মোস্তফা, সৈয়দ সাফাত ও গোলাম বাখারা। রিয়ার গার্ড হিসেবে হাসান থাকলেও, কোন কারণে রানা তাকে ডাকলে ওই দায়িত্ব নওশাদ পালন করবে।

এক মাইল পেরিয়ে এল ওরা। শুরু হলো ঢাল বেয়ে নিচে নামা। ঢালে আলগা পাথর ছড়ানো, খুব সাবধানে নামতে হচ্ছে। তিন হাজার ফুট নামতে হবে, তবে তথ্যটা চেপে রাখল রানা। নিচে অচিহ্নিত সীমান্ত, পথ বলে কোন কিছুর অস্তিত্বও নেই। দিনের বেলাই এই ঢাল বেয়ে নামা বিপজ্জনক; বিশাল আকৃতির বোল্ডারগুলোর আড়ালে কি আছে দেখা যায় না। এই রাতে শুধু তারার অস্পষ্ট আলো সাহায্য করছে ওদেরকে। অনেকক্ষণ ধরে নামছে ওরা, কেউ কোন অভিযোগ করছে না। মনে মনে খুশি রানা—সবারই শক্তি-সামর্থ্যের পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে।

এক ঘণ্টা পর লাইন থেকে সরে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ওকে যারা পাশ কাটাচ্ছে তাদের প্রত্যেককে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করল। মোস্তফা, সাফাত আর বাখারা ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। সবচেয়ে কাহিল মনে হলো মোস্তফাকে—সবার চেয়ে বয়েস তার বেশি, জাহাজে কাজ করায় হাঁটাচলার অভ্যাসও কম। বাখারা আর জামালও জাহাজে কাজ করেছে, তাদেরও হাঁটাচলার অভ্যাস কম, তবে বয়সে তরুণ হওয়ায় ধকলটা সামলে নিতে পারছে। যদিও সামনে এখনও লম্বা পথ পড়ে আছে। বাকি সবাই ঠিক আছে, চেহারায় ক্লান্তির কোন ছাপ পড়েনি এখনও। তবে শিরিনের হাত ধরে দাঁড় করাল রানা, বলল,

'একটু বিশ্রাম নাও তুমি।'

হাসান ও নওশাদের মাঝখানে ঢুকে পড়ল রানা, শিরিন ওর হাতটা ছাড়েনি। নওশাদ জিজ্ঞেস করল, 'এদিকে কোথাও চা পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারো?'

'তিনটে ফ্লাস্কে করে কফি আনা হয়েছে, তবে এখুনি পাচ্ছ না,' বলে দ্রুত পা চালিয়ে আবার কলামের সামনে চলে এল রানা, শিরিনকে রেখে এল হাসানের সঙ্গে। দশ মিনিট পর থামল ওরা। দশ মিনিটের বিরতি। কফি খেয়ে সবাই আবার চাঙা হয়ে উঠল। তারপর আবার ঢাল বেয়ে, বোল্ডার এড়িয়ে নেমে যাওয়া। আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পর জমিন সমান হয়ে এল। পাঁচ কি ছয় মিনিট পর গাইড লোকটা হঠাৎ দিক বদলে একটা গভীর নালায় নামিয়ে আনল ওদেরকে। সমতল জমিন থেকে প্রায় একশো ফুট নিচে নালার মেঝে। 'এখানে অপেক্ষা করুন,' বলল সে।

'সীমান্ত এখান থেকে কত দূরে?' জিজ্ঞেস করল রানা, ওর পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধ থেকে রাকস্যাকটা নামাচ্ছে হাসান।

গাইড হাসল না, শান্ত গলায় বলল, 'আমরা সীমান্ত পেরিয়েছি আধ মাইল পিছনে। এটা পিপল'স ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অভ ইয়েমেন। রাস্তা এখান থেকে বেশি দূর নয়। গাড়ি পৌছুতে আর পনেরো মিনিট।' ঘুরে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে।

সেদিকে তাকিয়ে কপালের ঘাম মুছল হাসান। 'মাসুদ ভাই!' অবাক গলায় বলল সে। 'লোকটার পা বায়োনিক নয় তো?'

মোস্তফার পাশে উবু হয়ে বসল রানা। মাটিতে কাত হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে সে, বুকটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'একটু পরই আমরা একটা ট্রাকে উঠব, ক্যাপটেন।'

কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানাবার জন্যে মোস্তফা শুধু মাথা দোলাতে পারল।

শিরিনও শুয়ে পড়েছে, তবে রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে উঠে বসল। তার কাঁধে চাপ দিয়ে আবার শুইয়ে দিল রানা।

ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ের ঘাম শুকাতে বেশিক্ষণ লাগল না। ঠিক পনেরো মিনিট পর এঞ্জিনের আওয়াজ সচকিত করে তুলল ওদেরকে। অন্ধকারে কোথাও থামল ওদের বাহন, এঞ্জিন অলস হয়ে পড়ল। নালার মাথা থেকে ভেসে এল আরব গাইডের গলা। 'জলদি! উঠে আসুন!'

নালা থেকে উঠে খানিকটা হাঁটতে হলো। সরু পাকা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাকটা। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ওরা। গাইড ওদের মাথার ওপর ক্যানভাস টেনে দিল। একটু পরই রওনা হলো ট্রাক।

টানা এক ঘণ্টা দ্রুতবেগে ছোটার পর বাঁক নিল ড্রাইভার, রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ল উঁচু-নিচু জমিনে। তারপর থামল, এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। ক্যানভাসের একদিকের কোণ উঁচু করল গাইড। 'নামুন!' গলায় তাগাদার সুর।

লাফ দিয়ে নিচে নামতেই চারপাশের আকাশের গায়ে অদ্ভুত সব কাঠামো লক্ষ করল রানা, সেই সঙ্গে নাকে ঢুকল কাঁচা মাটির সোঁদা গন্ধ, ডিজেলের তৈরি ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে আছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করল, ওদেরকে কোন

কনস্ট্রাকশন সাইটে আনা হয়েছে। এতক্ষণ আরব গাইড যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, তবে এখন তার মনে কি আছে কে জানে।

পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা কাঠের দালানে নিয়ে এল লোকটা। ভেতরে ঢোকার পর সুইচ অন করে আলো জ্বালল সে। রানা দেখল, ওরা সাইট এঞ্জিনিয়ারের অফিসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি জানালায় মোটা চট ঝুলছে। কামরার মাঝখানে কয়েকটা বেতের ঝুড়ি, ঢাকনি সহ। আঙুল তুলে সেগুলো দেখাল গাইড। 'ড্রেস আর বুট।' কাকে কি পরতে হবে তা-ও ব্যাখ্যা করল সে, কোথাও আটকাল না, গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেল। পাঁচজনকে পরতে হবে ইসরায়েলি অফিসারের ইউনিফর্ম–একজনকে কর্নেলের, একজনকে মেজরের, দু'জনকে ক্যাপটেনের, একজনকে লেফটেন্যান্টের। র‍্যাঙ্ক অনুসারে ব্যাজ ও পদক রয়েছে কাঠের একটা বাক্সে, সেটা টেবিলের ওপর। প্রতিটি ইউনিফর্ম কয়েক প্রস্থ আনা হয়েছে, বিভিন্ন সাইজের। যার যে সাইজ দরকার এখুনি পরে ফেলতে হবে। বারোটা হ্যান্ড লাগেজও আছে, তাতে পরিত্যক্ত কাপড়চোপড় আর অস্ত্র ভরতে হবে। সব কাজ শেষ হলে গাইড ওদেরকে পাস, আইডি কার্ড ও ট্রাভেল ডকুমেন্টস বিলি করবে। সময় খুব কম। তাড়াতাড়ি!

ঝুড়ির ভেতর ড্রেসগুলো সেলোফিন দিয়ে নিখুঁতভাবে জড়ানো, তারের হ্যাঙ্গারের সঙ্গে ঝুলছে। গাইডের দিকে ফিরে রানা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ-সব তোমরা যোগাড় করলে কিভাবে?'

'আমাদের এক লোক ইসরায়েলি এয়ার বেসে লন্ড্রি চালায়।'

বিশ মিনিটের মধ্যে ইউনিফর্ম পরা শেষ করল ওরা, প্রত্যেকের হ্যান্ডগ্রিপও প্যাক করা হয়ে গেছে। নওশাদ, মোস্তফা, বাখারা ও শিরিন এয়ার ফোর্স ইউনিফর্ম পরেছে, ইনসিগনিয়া বলে দিচ্ছে ওরা টেকনিকাল ব্রাঞ্চের সদস্য। বাকি সবার পরনে সিভিলিয়ানদের পোশাক। রানা পরেছে ফুল একজন কর্নেলের ইউনিফর্ম।

এরপর সবাইকে আইডেনটিটি ডকুমেন্ট দেয়া হলো। মেজর হিসেবে নওশাদের কাছে থাকল অফিশিয়াল মুভমেন্ট অর্ডার। কাগজ-পত্র সবই জাল, তবে দেখে নিখুঁত বলেই মনে হলো।

সবাইকে খুঁটিয়ে দেখে নিল গাইড, তারপর আলোর সুইচ অফ করে দিল। অন্ধকার জানালার সামনে চলে এল সে, চট সরিয়ে বাইরে তাকাল। নিঃশব্দে তার পাশে চলে এসেছে রানা। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'এরপর কি?'

হাত তুলে জানালার বাইরে অন্ধকার দেখাল গাইড। 'দক্ষিণ কোরিয়ানরা একটা অল-ওয়েদার মিলিটারি রোড তৈরি করছে। রোডটা এদিকের পুরানো রাস্তার ওপর দিয়ে যাবে।' রানাকে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করিয়ে রাখল সে, তারপর বলল, 'ইসরায়েলি টেকনিশিয়ানরা একটু পরই আসবে। তাদের জন্যে আমরা একটা সারপ্রাইজের ব্যবস্থা করেছি।' রানা অপেক্ষায় থাকলেও আর কিছু সে ব্যাখ্যা করল না।

বেশ কিছুক্ষণ কিছুই ঘটল না। তারপর হঠাৎ, অনেক দূরে, একটা টর্চ পরপর দু'বার সঙ্কেত দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল একজোড়া হেডলাইট। রাস্তার

মাঝখানে একটা কার, দক্ষিণ দিকে মুখ, সাইট এঞ্জিনিয়ারের অফিস থেকে দূরত্ব হবে পঁচিশ গজ। কারের পাশে ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। রাস্তার ওপারে, কারের ওদিকে, হেডলাইটের আলোর আভায় দেখা যাচ্ছে মাটির প্রকাণ্ড স্তূপ।

'আল্লাহ মেহেরবান!' আরব গাইডের চোখ অচঞ্চল, দৃষ্টি চকচকে। 'ওরা আসছে। আমি না বলা পর্যন্ত কেউ বেরুবেন না। এখন থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে এডেনের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবেন আপনারা।'

উত্তর থেকে ভেসে এল হেভি ভেহিকেলের গম্ভীর আওয়াজ, ক্রমশ বাড়ছে। অফিস কামরার লোকজন জানালার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুণছে, কারুরই ধারণা নেই ঠিক কি ঘটতে যাচ্ছে।

একটা সিঙ্গেল-ডেকার বাস, রঙ মিলিটারি গ্রীন, দৃষ্টিসীমায় বেরিয়ে এল। কারের পাশে দাঁড়ানো ইউনিফর্ম পরা লোক দু'জন টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিল থামার। ড্রাইভার বাস থামাল, বন্দী পশুর মত গজরাচ্ছে এঞ্জিন। উঁচু গলায় দু'চারটে কথা বলাবলির পর বাসের হেডলাইট ও এঞ্জিন বন্ধ করে দিল ড্রাইভার। তারপর সামনের অটোমেটিক দরজা হিসহিস শব্দ করে খুলে গেল, নিচে নামল সাদা পোশাক পরা এক লোক।

লোকটার পা মাটিতে নেমেছে কি নামেনি, কর্কশ ও শক্তিশালী একটা এঞ্জিন বাঘের মত গর্জে উঠল। সাইট অফিসের পাশের শেড বিস্ফোরিত হলো, সব ভেঙেচুরে বেরিয়ে এল দৈত্যাকার একটা বুলডোজার, ব্লেডটা নিচু করা। বুলডোজারের কপালে স্পটলাইট, চোখ-ধাঁধানো সাদা আলো যেন বাসটাকে গেঁথে ফেলেছে। অস্থির স্টীল ট্র্যাক থেকে ধুলোর একজোড়া স্তম্ভ খাড়া হলো, সেগুলো ভেঙে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, বুলডোজার চড়াও হলো অসহায় টার্গেটের ওপর। বাসের জানালায় বিমূঢ় চেহারা দেখা গেল, অত্যুজ্জ্বল সাদা আলো ধেয়ে আসছে দেখে হাত তুলে চোখ বাঁচানোর চেষ্টা করছে। আরোহীদের একজন, বাকি সবার চেয়ে ক্ষিপ্র, দরজা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারল। কিন্তু তারপরও দেরি হয়ে গেছে। বুলডোজারের প্রকাণ্ড ও চকচকে ব্লেড বাসের গায়ে গুঁতো মারতে ছিটকে বাসের ভেতর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

গিয়ার বদলাতে বুলডোজারের এঞ্জিনের আওয়াজ পাল্টে গেল, ট্র্যাকগুলো গেঁথে গেল মাটির আরও গভীরে। বাসটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে দানবটা।

যান্ত্রিক দানবের ঘন ঘন ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল বাস। বুলডোজার এখন সেটাকে ঠেলে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কংক্রিটের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে মেটাল, রি-রি করে উঠল শরীর। ঝন-ঝন শব্দে চুরমার হচ্ছে জানালার সমস্ত কাঁচ, তার সঙ্গে যোগ হলো ভেতরে বসা লোকগুলোর আর্তনাদ।

এক কি দু'সেকেন্ডের জন্যে রাস্তার কিনারায় ইতস্তত করল বাসটা, তারপর বুলডোজারের শেষ একটা ধাক্কা খেয়ে খসে পড়ল সম্প্রতি খনন করা বিশাল ও গভীর গহ্বরে।

গর্তের মেঝেতে বাসটা পড়তেই আরও একজোড়া যান্ত্রিক দানব জ্যান্ত হয়ে উঠল। গর্তটার তিন দিকের কিনারা থেকে তিনটে বুলডোজার কাজ শুরু করল।

বিশাল স্তূপ থেকে মাটি তুলে গর্তের ভেতর ফেলা হচ্ছে।

'ওহ্ গড!' বিড়বিড় করছে শিরিন, হাতে বেরিয়ে এসেছে ছোট্ট একটা ক্যামেরা। 'সরি,' বলে সেটা তার হাত থেকে কেড়ে নিল রানা।

'গো! নাউ!' আরব গাইড তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করল। সাইট অফিসের দরজা খুলে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাতছানি দিচ্ছে।

রাস্তার পাশে পৌঁছুল দলটা, ভোজবাজির মত ওদের সামনে এসে দাঁড়াল প্রথম বাসটার মত হুবহু আরেকটা বাস, হুইলের পিছনে বসে আছে প্রথম বাসেরই ড্রাইভার।

'জলদি!' তাগাদা দিল গাইড। 'এক ঘণ্টার মধ্যে ডকে পৌঁছুতে হবে আপনাদের। রুটিন ব্যাখ্যা করবে ড্রাইভার।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা; গম্ভীর গলা, নির্লিপ্ত চেহারা।

আরব গাইড স্মার্ট ভঙ্গিতে শ্রাগ করল। 'আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এরপর আপনাদের পালা। আল্লাহ আপনাদের সহায় হন।' ঘুরল সে, রানা ইতিমধ্যে বাসে উঠে পড়েছে।

বাস ছেড়ে দিল ড্রাইভার। পিছনে বুলডোজারগুলো এখনও গর্তে মাটি ভরছে।

হাসানের পাশের সীটে বসল রানা, সে এখনও পিছনের জানালা দিয়ে বুলডোজারগুলো দেখছে। খানিক পর বিড়বিড় করল সে, 'ওহ্ গড...'

রানার চেহারায় কোন আবেগ নেই। 'যুদ্ধটা কবে শুরু হয়েছে জানি না, তবে আজও সেটা থামেনি। তুমি কাউকে একা দায়ী করতে পারো না। তাছাড়া, অকালমৃত্যু হয় শুধু বোকাদের।'

সামনের সীটে বসা মোস্তফা একটা সিগারেট ধরাল, রানা লক্ষ করল তার হাত একটু একটু কাঁপছে।

চার

রোড কনস্ট্রাকশন সাইট থেকে এডেন শহরতলি পঁচিশ কিলোমিটার, রাস্তা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও দক্ষ ড্রাইভারের হাতে পড়ায় পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। সামনে পড়ল কয়েকটা লবণ কারখানা, ওগুলোকে ছাড়িয়ে এসে বাম দিকে বাঁক নিল বাস, নতুন এই রাস্তা খোরমাকসার-এর দিকে চলে গেছে। ড্রাইভার রানাকে সাবধান করে দিল—পুলিস বা পিপল'স মিলিশিয়া সিকিউরিটি চেক-এর জন্যে বাস থামাতে পারে। সবাই তারা ইয়েমেনি, তবে অফিসাররা ব্রিটিশ। কথাটা শোনার পর ইসরায়েলি ইউনিফর্ম পরা চারজনকে দরজার কাছাকাছি বসার নির্দেশ দিল রানা। কোন ঘটনা ছাড়াই খোরমাকসার পার হয়ে এল বাস। তবে থামতে হলো ক্রেইটার-এ ঢোকার আগে, শহরের ঠিক কিনারায়।

হেডলাইটের আলোয় ট্রাক ভর্তি পুলিস দেখা গেল, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সামনে পিছনে একটা করে জীপ। হালকা একটা কাঠের ব্যারিয়ার ফেলা

হয়েছে রাস্তার মাঝখানে, ওটার পাশে দশ-বারোজন ইউনিফর্ম পরা পুলিস।

ব্যারিয়ারের ঠিক সামনে বাস থামাল ড্রাইভার, তবে এঞ্জিন বন্ধ করল না। ইউনিফর্ম পরা এক তরুণ লেফটেন্যান্ট এগিয়ে এসে বাসের দরজায় হাতের লাঠি দিয়ে টোকা মারল। দরজা খুলে যেতে বাসে চড়ল লেফটেন্যান্ট, চেহারায় গাম্ভীর্য নিয়ে আরোহীদের ওপর চোখ বোলাচ্ছে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে, নওশাদ সীট ছেড়ে এগিয়ে এল—তার চোখ ঢুলু ঢুলু, পদক্ষেপ এলোমেলো। হিব্রু ভাষায় তীর ছুঁড়তে শুরু করল সে, তীর না বলে বুলেট বললেও চলে। ঘাবড়ে যাওয়ায় নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট। নওশাদ নাছোড়বান্দা, লোকটার ওপর এমন ভঙ্গিতে ঝুঁকল, ধাপ বেয়ে নিচে নামতে বাধ্য হলো লেফটেন্যান্ট। নওশাদের আচরণ বেসামাল, মুখে ফুটন্ত খইয়ের মত দুর্বোধ্য ভাষা, মারমুখো ভাব। লেফটেন্যান্ট বাস থেকে নেমেও পার পেল না, নওশাদ তাকে প্রায় ধাওয়া করল। বাসের ভেতর থেকে আরোহীরা দেখল লেফটেন্যান্ট দ্রুত ইশারা করছে। ব্যারিয়ার তুলে ফেলা হলো। টলতে টলতে বাসের ধাপে ফিরে এল নওশাদ, মাথা ঝাঁকিয়ে বাস ছাড়ার ইঙ্গিত দিল ড্রাইভারকে। বাস আবার সচল হলো, বিমূঢ় লেফটেন্যান্ট এক সেকেন্ড ইতস্তত করে স্যালুট করল—ঠিক বোঝা গেল না কাকে।

রানার দিকে একটু ঝুঁকে হাসান জানতে চাইল, 'কি ঘটল বলুন তো?'

রানা উত্তর দেয়ার সুযোগ পেল না, তার আগেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল মোস্তফা। হাসি থামিয়ে বলল, 'ইয়েমেনিরা সাপের চেয়েও বেশি ভয় পায় মাতাল ইসরায়েলিদের। নওশাদের অভিনয় কোনদিন ভুলব না।'

খানিক পর ঘাড় ফিরিয়ে ড্রাইভার বলল, 'প্রায় পৌঁছে গেছি।'

হাসাহাসি থেমে গেল। রাস্তা ছেড়ে সরু একটা উপত্যকায় পড়ল বাস। সাগরের গর্জন ভেসে এল কানে। সামনে পড়ল জেলেদের একটা পাড়া। সেটাকে ছাড়িয়ে বাস উঠল সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সরু একটা রাস্তায়। এখানেই প্রথম কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হবে ওদেরকে। ধোঁকা দিতে না পারলে জাহাজে ওঠার কোন আশা নেই।

জেটির গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল বাস। হিস্‌স্‌ শব্দ করে খুলে গেল দরজা। জেটির শেষ মাথায় একটা আলো, সেদিকে হাত তুলল ড্রাইভার।

বাসের পাশে একজন ন্যাভাল রেটিং এমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, পায়ে যেন পেরেক গাঁথা। বাসের দরজার দিকে চোখ, চোখে পলক পড়ছে না। প্রথমে একা নিচে নামল রানা। লোকটা তবু নড়ে না। মানুষ না মূর্তি? না, মানুষ। অন্তত কথা বলতে পারে। তা-ও শুধু ঠোঁট জোড়া নড়ল। 'আপনাদের বোট ওদিকে,' গলার আওয়াজ খুব নিচু। 'একটা লঞ্চ। ওটাই আপনাদেরকে জাহাজে তুলে দেবে।'

বাস থেকে সবাই নামার পর সবার আগে থাকল নওশাদ, বাকি সবাই তার পিছু নিল। জেটির শেষ মাথায় লঞ্চটা, ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। ইউনিফর্ম দেখে স্যালুট করল সেইলর। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মুভমেন্ট অর্ডারটা তার হাতে ধরিয়ে দিল নওশাদ। দু'একটা বাক্য বিনিময় হলো। ইঙ্গিতে গ্যাংপ্ল্যাঙ্কটা দেখিয়ে দিল রেটিং। লঞ্চটা চল্লিশ ফুট হারবার পেট্রল ভেসেল, পাঁওটে রঙ চকচক করছে।

হুইলহাউস থেকে একজন পেটি অফিসার গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল। গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক তুলে লাইন খোলা হলো। ধীরে ধীরে জেটি ছেড়ে দূরে সরে এল লঞ্চ।

বে থেকে খোলা সাগরে বেরুবার আগে, জলপথের দু'পাশে, নোঙর ফেলা বেশ অনেকগুলো জাহাজের রাইডিং লাইট দেখতে পেল ওরা, অন্ধকার আকাশের গায়ে মিট মিট করছে। লঞ্চের গতি বাড়ছে, ওরা সবাই হ্যান্ডহোল্ড ধরে আছে। পিছনে দোল খাচ্ছে তীরে ছড়ানো আলোর বিন্দুগুলো।

বড় আকৃতির একটা মিসাইল ক্রুজারের বো ঘুরে এগোল লঞ্চ, তির্যক পথ ধরে নোঙর ফেলা গাঢ় একটা কাঠামোর দিকে এগোচ্ছে। ওটাই ওদের জাহাজ। সামনের দিকের লিভিং কোয়ার্টারে অল্প দু'চারটে আলো জ্বলছে। লঞ্চ কাছে চলে এল। একটাই চিমনি। চিমনির সামনে ব্রিজ, সেখানে লোকজন নড়াচড়া করছে। অ্যাকোমোডেশন ল্যাডার উজ্জ্বল আলোয় ভেসে যাচ্ছে, লঞ্চ ভিড়াতে কোন সমস্যা হলো না। বো থেকে একজন রেটিং ছুঁড়ে দেয়া লাইন টেনে ধরল, পেট্রল বোট যাতে স্থির থাকে।

'সিদ্ধান্ত পাল্টাবার এটাই শেষ সুযোগ,' সকৌতুকে ফিসফিস করল নওশাদ।

ওপর দিকে মুখ তুলে রানা দেখল কয়েক জোড়া কৌতূহলী চোখ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। 'উঁহুঁ,' বলল ও, গলা খাদে নামানো। 'আমার উদ্দেশ্য–প্রতিশোধ নেয়াটা–মহৎ। যাতে এরপর আমাদের গায়ে হাত তুলতে কেউ একশো-এক বার চিন্তা করে। তোমরা সবাই আমার উদ্দেশ্য সমর্থন করায় সঙ্গী হয়েছ। টাকাটা তোমাদের উপরি পাওনা।'

হ্যান্ডরেইল ধরে মইয়ে পা রাখল রানা, ধাপ বেয়ে তরতর করে ডেকে উঠে এল। সামনেই পড়ল একজন অফিসার। অফিসারের দু'হাত পিছনে প্রকাণ্ডদেহী একজন মেরিন, টান টান আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, বুকে আড়াআড়িভাবে ধরে আছে একটা সাব মেশিনগান। রানা স্যালুট ফিরিয়ে দিতে অফিসার বলল, 'সেকেন্ড অফিসার অলটি মেয়ার, স্যার। গোল্ডা মেয়ারে আপনাকে স্বাগতম।'

'কর্নেল মেনাচিম নাহান–এয়ার ফোর্স টেকনিক্যাল সার্ভিস।'

'ক্যাপটেন বেন দাইয়ান শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, বিশ্রাম নেয়ার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি খুশি হবেন।'

'আমার হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবেন, বলবেন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আমিও অপেক্ষা করছি।' রানা সচেতন, তার পিছনে জড়ো হচ্ছে সবাই। 'এবার আপনি আমার টীমকে অ্যাকমোডেশন দেখিয়ে দিন, প্লীজ। তবে আমাকে প্রথমে মিসাইলগুলো ইন্সপেক্ট করতে যেতে হবে।'

অলটি মেয়ার তাকিয়ে থাকল। 'মিসাইল ইন্সপেক্ট করবেন?'

'অবশ্যই,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রানা। 'ওগুলোর দায়িত্ব আমার ওপর।'

'কিন্তু, কর্নেল, আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি ওগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদে আছে। মেরিনরা...'

'সেকেন্ড অফিসার অলটি মেয়ার,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা। 'ওই মিসাইলগুলো ইসরায়েলি ডিফেন্স সিস্টেমের একটা ভাইটাল পার্ট। ওগুলো নিরাপদে আছে কি নেই, সেটা বিচার করার অধিকার আপনাকে দেয়া হয়নি। সে অধিকার আমার।

কাজেই আমার নির্দেশ পালন করুন।'

চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল, স্যালুট করল অলটি মেয়ার।

চেহারা দেখে পাষাণ বা জল্লাদ মনে হলে কি হবে, কর্নেল অর্থাৎ রানার দিকে সশ্রদ্ধ সমীহ ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে নওশাদ, তার উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। সেকেন্ড অফিসার গোটা টীমকে নিয়ে এগোল এবার। মেরিনের দিকে ফিরল রানা, বলল, 'মিসাইল। দেখাও আমাকে।'

লোকটার পিছু নিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে এগোল রানা, মই বেয়ে নেমে এল ব্রিজের সামনে মেইন ডেকে। গোল্ডামেয়ার সাধারণ স্পারটাক ক্লাস মার্চেন্ট শিপ। এঞ্জিন রূম, ব্রিজ ও ক্রু কোয়ার্টার, সবই সামনের দিকে, দৈর্ঘ্যের বাকি অংশ দখল করে রেখেছে ফোরডেক, তিনটে কার্গো হ্যাচ সহ।

দাঁড়িয়ে পড়ল মেরিন। হাত তুলে দেখাল। 'মিসাইল, কর্নেল, স্যার।'

মোটাসোটা ও লম্বা একটা আকৃতি দেখল রানা, তারপুলিন দিয়ে ঢাকা, স্টীল ডেকে বাঁধা রয়েছে জাহাজের গা ও তিন নম্বর হ্যাচের মাঝখানে। আরও একটা দেখা গেল হ্যাচের সঙ্গেই বাঁধা। তৃতীয়টা ডেকের স্টারবোর্ড সাইডে। মেরিনের পিছু নিয়ে সামনে এগোল রানা, অন্ধকারে অদৃশ্য বাধায় ধাক্কা খাচ্ছে। ফোরপীক-এ পৌঁছুতে একটা ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে আসতে দেখল। আরেকজন মেরিন। প্রথম মেরিনের দিকে ফিরল রানা। 'গুনে নয়টা মিসাইল পেলাম। বাকিগুলো কোথায়?'

'দু'নম্বর হোল্ডে, কর্নেল, স্যার। ওঅরহেড খুলে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে।'

'আই সী। আর পাহারায় আছ শুধু তোমরা দু'জন?'

'না, স্যার। চারজন।'

'বাকি দু'জন কোথায়?'

'কোয়ার্টারে, স্যার।'

'দেখাও আমাকে।'

ছোট একটা কেবিন দেয়া হয়েছে হাসান, নওশাদ আর সাদাতকে। বাঙ্কে শুয়ে ডেকহেডের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছে হাসান। এখন পর্যন্ত সব কিছু ভালভাবেই ঘটেছে। শুধু মেরিনের উপস্থিতিই ওকে একটু ভাবিয়ে তুলেছে। একজন যখন আছে, নিশ্চয়ই আরও থাকার কথা। সে আন্দাজ করল, ফিরে এসে সংখ্যাটা জানাতে পারবে রানা। গোল্ডামেয়ারে শুধু ন্যাভাল রিজারভিস্টরা থাকবে বলে শোনা গিয়েছিল। তবে ওদের ধরে নেয়া উচিত ছিল সশস্ত্র প্রহরা না থেকে পারে না, জাহাজে যেহেতু মিসাইল রয়েছে। হাইজ্যাকের প্রথম পর্যায়েই বন্দুকযুদ্ধ শুরু হোক, এটা ওরা চায় না।

'সমস্যা?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল নওশাদ।

'মেরিনরা,' বলল হাসান।

বাঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়াল নওশাদ। 'সবুর করো। আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও।'

এই সময় জাহাজের মেইন এঞ্জিন চালু হতে কেঁপে উঠল ডেক।

হাসান বলল, 'চিন্তা করার বেশি সময় পাবে না। এখন থেকে তিন ঘণ্টা পর

আমাদের শুরু করার কথা।'

কেবিনের দরজায় নক হলো। ভেতরে ঢুকল রানা। 'সবাইকে অভিনন্দন!' হাসিমুখে বলল। 'তোমরা এত বিমর্ষ কেন?'

নওশাদ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ছিলে, ভাই?'

'ছিলাম,' হাসিমুখেই বলল রানা, 'ক্যাপটেনের সঙ্গে, তিনি আমাকে ককটেল দিয়ে আপ্যায়ন করেছেন।'

হাসান কাজের কথা পাড়ল। 'মেরিনরা ক'জন, মাসুদ ভাই?'

'সেটা জানতেই তো এত সময় লাগল,' বলল রানা। 'মেরিন গার্ড চারজন। দু'জন করে ডিউটি দেয়। একজন সার্জেন্ট। চার ঘণ্টা পর পর পালা বদল। পরবর্তী পালা বদল দুটোয়। ওদের কোয়ার্টার হসপিটালের পাশেই।' হাসানের প্রতিক্রিয়া দেখে ভুরু কোঁচকাল। 'কোন সমস্যা, জিয়া?'

'আমাদের ছয়জনকে হসপিটালে থাকতে দেয়া হয়েছে,' বলল হাসান।

প্রকাণ্ডদেহী নওশাদ দুই তালু এক করে ঘষল। 'আমাদের জন্যে সুবিধেই হলো।' এঞ্জিন-রূম টেলিগ্রাফের অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল। ডিজেল সাড়া দেয়ায় পায়ের তলায় কাঁপুনি অনুভব করল ওরা। গালফ অভ এডেন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে গোল্ডামেয়ার। সময় জিরো-জিরো-থারটি আওয়ারস, মঙ্গলবার রাত।

কাঁটায় কাঁটায় রাত দেড়টা। সুইচ টিপে আলো নেভাল হাসান। কেবিনের দরজা খোলার সময় কোন শব্দ হলো না। বাইরের প্যাসেজওয়ে ফাঁকা। কান পেতে থাকল, এঞ্জিনের একটানা ভোঁতা গুঞ্জন ছাড়া অন্য কোন শব্দ হচ্ছে না। একটা আঙুল তুলে সাদাতকে ইঙ্গিত দিল, তারপর বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। ওদের পিছনে কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিল নওশাদ।

নিঃশব্দ পায়ে প্যাসেজ ধরে জাহাজের সামনের দিকে এগোচ্ছে ওরা, বাঁক ঘুরে পোর্ট-সাইড প্যাসেজওয়েতে চলে এল। কেউ কোথাও নেই। হসপিটালের দরজায় টোকা মারল হাসান। দরজা খুলে যেতে সাদাতকে পিছনে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ওরা ভেতরে ঢুকতেই জ্বলে উঠল আলোটা।

শিরিন, জামালু, সোলায়মান, জুবায়ের ও সাসভিক রাহমানও কালো ড্রেস ও রাবার সোল লাগানো বুট পরে তৈরি হয়েই আছে। সবার ওপর চোখ বুলিয়ে ফিসফিস করল হাসান, 'পাঁচ মিনিট।'

ক্যাপটেন বেন দাইয়ান হাতের গ্লাসটা উঁচু করে হাসলেন, হিব্রু ভাষায় বললেন, 'আসুন, কর্নেল নাহান, আমরা ইসরায়েলি ডিফেন্স সিস্টেমের বর্ধিত অংশের সাফল্য কামনা করে পান করি।'

'...করি,' বলে নিজের গ্লাসটা ক্যাপটেনের গ্লাসে ঠুকল রানা, করি উচ্চারণ করার আগে মনে মনে বলল 'ধ্বংস কামনা।' একযোগে গলায় ককটেল ঢালল ওরা। দুটো গ্লাস আবার ভরলেন ক্যাপটেন, ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালেন।

'প্লীজ, বসুন, কর্নেল নাহান। আরাম করে বসুন।'

ইনার বাল্কহেডের সঙ্গে লোহার আংটা দিয়ে আটকানো একটা সেটীতে গা এলিয়ে দিল রানা। কেবিনের ফার্নিচার বেশি নয়, তবে সবই খুব দামী। সুইভেল

চেয়ারটা ডেস্কের পিছন থেকে সরিয়ে এনে রানার সামনে নিয়ে এলেন ক্যাপটেন, বসলেন রানার মুখোমুখি। আরব আমীরদের মত আয়েশী একটা ভাব আছে তাঁর আচরণে, বয়েস হবে চল্লিশের মত, বেশ মোটাসোটা। গ্লাসে চুমুক দেয়ার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আশা করি অ্যাকমোডেশনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, আপনার লোকজন তাতে অসন্তুষ্ট বোধ করছেন না।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তবে টেকনিক্যাল এক্সপার্টদের কথা বলতে পারব না, ওরা আরও উন্নতমানের আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত।'

ক্ষীণ একটু হাসলেন ক্যাপটেন। 'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আরেকটু নিন, কর্নেল?'

উল্টোদিকের বাল্কহেডে বসানো ক্রনোমিটারের দিকে তাকাল রানা। একটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। অ্যাকশন শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। 'উইথ প্লেজার, ক্যাপটেন। আমার যে পেশা, রুল বা ডিসিপ্লিন শিথিল করার সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়।' হাসিমুখে ডান পায়ের ওপর বাম পা তুলল। এখানে অনেকক্ষণ থাকতে হবে ওকে। সময়টা উপভোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

হসপিটালের পাশের দরজা সামান্য একটু শব্দ করে বন্ধ হলো। বাঙ্কে শোয়া লোক দু'জন নড়ল না। একজনের নাক ডাকছে। রাহমানভ আর সোলায়মান বেল্ট থেকে টেনে হাতে নিল উজি সাবমেশিন গান, উল্টো করে ধরল, তারপর একযোগে নামিয়ে আনল ঘুমন্ত লোক দুজনের মাথায়। মাথার নিচে থেকে বালিশ দুটো টেনে বের করল ওরা, চেপে ধরল দু'জনের মুখে।

মেরিন দু'জন মারা যেতে বালিশ দুটো আবার তাদের মাথার নিচে গুঁজে দিল ওরা, বিছানার চাদর ঠিকঠাক করল, ফিরে এসে দাঁড়াল দরজার দু'পাশে। রাহমানভ দাঁড়িয়েছে বাল্কহেডের পাশে, ওটা মেরিনদের কেবিন আর হসপিটালের মাঝখানে। উজি দিয়ে বাল্কহেডে মৃদু টোকা দিল দু'বার—জানিয়ে দিল ওরা সফল হয়েছে।

প্যাসেজের ওপারে, অন্ধকার ল্যাভাটরিতে রয়েছে সাদাত। দরজা সামান্য ফাঁক, সেই ফাঁকে চোখ রেখে ডেক মেরিনদের একজনের ফেরার অপেক্ষায় আছে সে। দু'জনের ঘুম ভাঙাতে একজনেরই আসার কথা। একা একা আপনমনে হাসছে সে। মাসুদ রানার সঙ্গে কোন অপারেশনে থাকার মানেই হলো উত্তেজনাকর রোমাঞ্চময় একটা নতুন জগতে প্রবেশ করা। অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছে সে। রানার প্ল্যান ঘড়ির কাঁটা অনুসরণ করে, কেউ যদি দেরি করে ফেলে বা পিছিয়ে পড়ে, পরিস্থিতিই তাকে আজরাইলের ভূমিকা থেকে সরিয়ে দেবে—ছিলে শিকারী, হও শিকার।

আওয়াজ শুনে দরজা আরও এক সুতো ফাঁক করল সাদাত। প্যাসেজের এক প্রান্তে একজন মেরিনের সঙ্গে কথা বলছে এক লোক, হাতে দুটো মগ। দু'জনেই যদি এদিকে আসে, বিপদে পড়ে যাবে সে। তবে না, এল না। হেসে উঠে ঘুরল মেরিন, প্যাসেজওয়ে ধরে হেঁটে আসছে, ডান কাঁধ থেকে ঝুলছে অ্যাসল্ট রাইফেল। অপর লোকটা মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে, ব্রিজই সম্ভবত তার গন্তব্য।

শিরদাঁড়ার কাছে বেল্টে গোঁজা নাইন এমএম অটোমেটিকে ডান হাত বোলাল সাদাত।

কেবিনের দরজার হাতলে হাত দিয়েছে মেরিন, ল্যাভাটোরি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে উজির বাঁটটা সবেগে তার ঘাড়ে নামিয়ে আনল সাদাত। খুলতে শুরু করা দরজার ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেরিন। তার উজিটা মেঝেতে পড়ার আগেই ধরে ফেলল সোলায়মান, অচেতন শরীরটাকে আলিঙ্গন করল রাহমানভ। উজির বাঁট দিয়ে মেরিনের মাথায় আরেকটা আঘাত করল সে।

বাইরে থেকে কেবিনের দরজা বন্ধ করে হসপিটালে ফিরে এল সাদাত।

'রিপোর্ট,' বলল হাসান।

'তিনজন খতম, আর একজন বাকি,' বলল সাদাত।

ওদিকে, পাশের কেবিনে, মেরিনদের ইউনিফর্ম পরে মাথায় ক্যাপ বসাল সোলায়মান, রাহমানভকে বলল, 'পাঁচ মিনিট পর বেরুবে তুমি।' রাহমানভও ড্রেস পাল্টে নিয়েছে। 'দরজায় তালা দিতে ভুলো না।'

'বলুন দেখি, কর্নেল, দেশের হাল-হকিকত কেমন দেখে এলেন?' ক্যাপটেনও পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসলেন।

'কতদিন হলো দেশের বাইরে আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উনিশ মাস,' বেন দাইয়ান ম্লান সুরে বললেন। 'প্রাণটা বড়ই আনচান করে।'

'আমি তো বলব, আইজ্যাক রাবিন খুন হবার পর যেমনটি আশা করা হয়েছিল, দেশের অবস্থা তারচেয়ে আরও খারাপ হয়েছে।'

'রাবিনকে যারা বেঈমান মনে করে, আমি বরং তাদেরকে সমর্থন করার কিছুটা যুক্তি খুঁজে পাই,' বললেন ক্যাপটেন দাইয়ান। 'ফিলিস্তিনীরা টেরোরিস্ট, আর টেরোস্টিদের লীডার হলো ইয়াসির আরাফাত। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন, নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে একজন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীকে স্বীকৃতি দেয়া হলো! গাজা ওদেরকে ছেড়ে দেয়াটা মারাত্মক ভুল হয়েছে, আপনি কি বলেন?'

'ভুল মানে! সিমন পেরেজ বিদায় নেয়ার পর নেতানেয়াহুর উচিত ছিল আমেরিকার কথায় কান না দিয়ে ফিলিস্তিনীদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করা।'

'নেতানেয়াহু কেন যে...'

'শেষ খবর জানেন? বিদেশ থেকে যে-সব রাষ্ট্রীয় উপহার পেয়েছেন নেতানেয়াহু, কোনটাই সরকারী মালখানায় জমা দেননি, সব নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। ইয়াহুদ বারাক সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছে।'

মাথা নেড়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ক্যাপটেন, হাত বাড়ালেন বোতলটার দিকে। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে শুনলেন তিনি। 'মাফ করবেন, কর্নেল। আমাকে ব্রিজে যেতে হচ্ছে। প্লীজ, বসুন আপনি। ফিরতে আমার দেরি হবে না। পান করুন।' ক্যাপটা মাথায় চাপিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কাছাকাছি কোথাও থেকে ওয়ায়্যার টেলিগ্রাফি সিস্টেম জ্যান্ত হয়ে ওঠার আওয়াজ শুনতে পেল রানা, সেটা থামতে না থামতে কী টিপে সাড়া দিচ্ছে কেউ।

পাশের কোন কামরায় রেডিও কেবিন, সেখানে অবশ্যই একটা লিসনিং ওয়াচ বসানো হয়েছে। জিরো আওয়ারে ওটার ব্যবস্থা করতে হবে।

হাই উঠছিল, সেটা থামিয়ে সেটি ছাড়ল রানা। কান পাতল। তারপর ডেস্কের সামনে এসে বাক্স থেকে চুরুট নিল একটা, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ভাবছে, ক্যাপটেনের ডেস্কে হ্যান্ডগান থাকলে এখনই সেটা সরিয়ে ফেলার আদর্শ সময়।

স্টীল ডেস্কে দুটো দেরাজ। আওয়াজ হবার ভয়ে ধীরে ধীরে প্রথমটা খুলছে রানা। ভেতরে কাগজ-পত্র। পিছন থেকে একটা গলা ভেসে এল।

'কি খুঁজছেন আপনি?'

রানা চমকে ওঠেনি। ঘুরলও অলস ভঙ্গিতে। পর্দা ফেলা দরজার ভেতর সাদা জ্যাকেট পরা এক লোক দাঁড়িয়ে, কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। 'আমার যে পদমর্যাদা, তাতে তুমি আমাকে কর্নেল ও স্যার বলতে বাধ্য,' শান্ত ও ঠাণ্ডা সুরে বলল ও। 'কে তুমি?'

'দাউদ সুলেরি। অফিসার'স স্টুয়ার্ড...কর্নেল।' লোকটার দৃষ্টি ও গলায় প্রবল সন্দেহ।

'সেক্ষেত্রে, স্টুয়ার্ড সুলেরি, আমাকে একটা লাইটার খুঁজে দাও। এখুনি!'

'ক্যাপটেনের ডেস্কে দেশলাইয়ের একটা বাক্স সব সময় থাকে, কর্নেল,' বলল সুলেরি।

'তাহলে হয়তো আমার চেয়ে তোমার চোখের জ্যোতি বেশি।'

ডেস্কে সত্যি দেশলাই আছে কিনা চেক করার ঝোঁকটা দমন করল রানা. দেখেছে কিনা মনে পড়ছে না।

রানার দিকে কয়েক পা এগোল স্টুয়ার্ড, চকিতে বারবার ডেস্কের দিকে তাকাচ্ছে। সম্ভাব্য ঘটনার জন্যে শক্ত হচ্ছে রানা, ঝাঁকি খেয়ে একপাশে সরে গেল পর্দা, ভেতরে ঢুকলেন বেন দাইয়ান। রানা সুলেরির দিকে পালা করে কয়েকবার তাকালেন তিনি, সহজেই বুঝতে পারছেন দু'জনের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে। 'সুলেরি!'

ধীরে ধীরে ডেস্কের দিকে পিছন ফিরল স্টুয়ার্ড। লোকটার আচরণে আশ্চর্য একটা আত্মবিশ্বাস রানার দৃষ্টি এড়ায়নি। অটল দাঁড়িয়ে থাকল সে। অপেক্ষা করছে।

'এখানে এ-সময় কি করছ তুমি?' মাথা ঝাঁকিয়ে ক্রনোমিটারটা দেখালেন বেন দাইয়ান। সময় এখন একটা বেজে আটান্ন মিনিট।

'ডিউটি শেষ করার আগে শেষ একবার চক্কর দিতে বেরিয়ে ছিলাম। এখানে ঢুকে দেখি কর্নেল আপনার ডেস্কের ড্রয়ার খুলছেন। বলছেন, লাইটারের খোঁজে...'

ঝট করে রানার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন ক্যাপটেন। 'কথাটা সত্যি, কর্নেল?' ঠাণ্ডা, নিচু গলায় প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন দাইয়ান।

'হ্যাঁ,' হেসে উঠে বলল রানা। 'ভাবলাম লাইটারটা আপনি হয়তো দেরাজেই রেখে গেছেন। অথচ আপনার এই বেয়াদব ক্রু সম্ভবত আভাসে বলতে চাইছে আমি চোর।' আরও জোরে হেসে উঠল ও।

হাত দুটো মুঠো পাকাল সুলেরি। 'না,' তাড়াতাড়ি বলল সে। 'আমি শুধু

বলতে চেয়েছি, ডেস্কের ওপর একটা দেশলাই সবসময় থাকে।'

'সেক্ষেত্রে তোমার ভুল হয়েছে,' কঠিন সুরে বললেন ক্যাপটেন দাইয়ান। জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে দেশলাই বের করলেন।

সেটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সুলেরি।

পা বাড়াল রানা, ক্যাপটেনের হাতের তালু থেকে দেশলাইটা নিয়ে চুরুট ধরাল, তারপর ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকাল সুলেরির দিকে। 'এবার তোমার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।'

পাঁচ

তিন নম্বর হোল্ডের পাশে কাঠের বাক্সে ভরা মিসাইল গাঢ় ছায়া তৈরি করেছে, সেই ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সোলায়মান, কাঁধ থেকে ঝুলছে উজিটা। ওর ওপর দিকে এক সারি পোর্টহোলে আলো দেখা যাচ্ছে। আরও ওপরে, সুপারস্ট্রাকচার থেকে বেরিয়ে এসেছে ব্রিজের উইং, নির্জন ও ফাঁকা। পোর্টসাইডে তাকাল সে, বড় একটা জাহাজের আলো নির্দিষ্ট গতিতে উল্টোদিকে সরে যাচ্ছে। সামান্য হলেও, তার তলপেট সুড়সুড় করছে। চোখ কুঁচকে বোর দিকে তাকাল, আশা শেষ মেরিনটাকে যদি দেখতে পায়।

পিছনে শব্দ হলো। মই বেয়ে নেমে আসছে কেউ। রাহমানভ। 'কোথায় সে?' ফিসফিস করল বসনিয়ান।

মাথা ঝাঁকিয়ে বোর দিকটা দেখাল সোলায়মান। 'ওদিকে কোথাও। খুঁজে বের করতে হবে তোমার।'

উজিতে বেয়োনেট ফিট করল রাহমানভ, চোখ বুলিয়ে দেখে নিল ব্রিজ এরিয়ায় কিছু নড়ে কিনা। লোক নেই, সচল কোন ছায়াও নেই। সাব মেশিনগান বাগিয়ে ধরে বোর দিকে এগোল সে। উজির সেফটি অফ করে পজিশন নিল সোলায়মান, বিপদ দেখলে গুলি করার জন্যে প্রস্তুত।

নিঃশব্দ পায়ে বাঁক ঘুরে এক নম্বর হ্যাচওয়ের শেষ প্রান্তে চলে এল রাহমানভ, মাথার ওপর বাক্সে ভরা চল্লিশ ফুট লম্বা মিসাইল ঝুলছে। সতর্ক পায়ে স্টারবোর্ড সাইডের দিকে এগোচ্ছে সে। হঠাৎই দেখতে পেল লোকটাকে। রেইলের ওপর ঝুঁকে অন্ধকার সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে, রাইফেলটা বাল্কহেডের গায়ে খাড়া করা। উজিটা অ্যাটাক পজিশনে বাগিয়ে ধরে খুন করার জন্যে দ্রুত এগোল রাহমানভ। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘাড় ফেরাল মেরিন। বেয়োনেটের ডগা তার গলায় বিঁধল, পিছনের চাপে ঢুকে গেল হাতল পর্যন্ত। রেইলিঙের গায়ে হেলান দিল মেরিন, ডেক থেকে শূন্যে উঠছে পা দুটো। বেয়োনেট সহ উজি নিয়ে সাগরে পড়ে গেল সে।

মেরিনের অ্যাসল্ট রাইফেলটা বাল্কহেড থেকে হাতে নিল রাহমানভ, কাঁধে ঝুলিয়ে ধীর পায়ে ডেক ধরে ফিরে আসছে। জাহাজের কোথাও কোন শোরগোল বা অস্থিরতা নেই। মেরিনের সাগরে পড়ে যাওয়া কারও চোখে ধরা পড়েনি।

*

'টাইম চেক,' বলল হাসান। 'চার মিনিট। এই মুহূর্তে সময় জিরো-থ্রী-টোয়েনটি-সিক্স...রেডি! মুভ আউট!' হসপিটালের দরজা খুলে প্যাসেজওয়েতে চোখ বোলাল, তারপর সরে দাঁড়িয়ে বেরুবার পথ করে দিল ওদেরকে–নওশাদ, সাদাত, জানশের ও মোস্তফা বেরিয়ে এল। দরজা বন্ধ করল হাসান, তার পিছু নিয়ে ব্রিজের দিকে এগোল ওরা।

সোলায়মান ও রাহমানভ, এখনও মেরিন ইউনিফর্ম পরে আছে, ক্রু কোয়ার্টারের দিকে যাবার পথে কম্প্যানিয়নওয়েব মাথায় মিলিত হলো হাসানের সঙ্গে। ইঙ্গিতে পিছু নিতে বলে মই বেয়ে নেমে এল সে নিচের প্যাসেজে। আলো এখানে খুব কম। বাকি দু'জন তার ঠিক পিছনেই থাকছে। পায়ে রাবার-সোল বুট, কোন শব্দ হচ্ছে না। ক্রু মেসের দরজা খোলা। বাল্কহেডের গায়ে সেঁটে এল ওরা। হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ধরা। সময় আছে আড়াই মিনিট।

ওদিকে জুবায়ের, বাখারা, শিরিন ও জামালু এঞ্জিন রূমের বন্ধ দরজার পাশে জড়ো হয়েছে। জুবায়ের লক্ষ করল বাখারা তার উজিটা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ধরে আছে, চেহারায় বিতৃষ্ণ একটা ভাব। শান্ত একটা হাত বাড়াল জুবায়ের, সেফটি ক্যাচটা অফ করে দিল। 'তৈরি থাকার বিকল্প নেই,' ফিসফিস করল সে।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল বাখারা। তার উদ্দেশে চোখ মটকাল জামালু। 'ইসরায়েলিরা হয়তো তোমাকে দেখামাত্র ভয়েই পটল তুলবে।'

বাকি সবাই নিঃশব্দে হাসল।

নওশাদ, সাদাত, মোস্তফা ও জানশের গুড়ি মেরে বসে আছে ব্রিজ ল্যাডার-এর গোড়ায়, ছায়ার ভেতর। নওশাদের ঘড়ি সতর্ক করে দিচ্ছে ওদের হাতে আর দু'মিনিট সময় আছে। নিঃশব্দে ঘড়িটা দেখিয়ে একজোড়া আঙুল খাড়া করল সে।

ওদের মাথার ওপর ব্রিজ হাউসের দরজা খুলে গেল হঠাৎ, কেউ একজন বেরিয়ে এল উইং-এ। লোকটা কাউকে ডাকছে। আরও গাঢ় ছায়ায় সরে এল ওরা। একটু থেমে আবার ডাক দিল লোকটা, গলা আরেকটু চড়িয়ে।

মোস্তফা নওশাদের কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বিড়বিড় করল, 'মেরিনদের ডাকছে।' 'সাড়া না পেলে আমাদের জন্যে চিন্তার কথা,' ফিসফিস করল নওশাদ। হাসছে সে।

ওপর থেকে ভেসে আসা আওয়াজ শুনে বোঝা গেল, ব্রিজ হাউজে ফিরে গেল লোকটা।

নস্টালজিয়ায় পেয়েছে ক্যাপটেন বেন দাইয়ানকে, তেল আবিবের স্মৃতি রোমন্থন করছেন। হঠাৎ ব্রিজ টেলিফোন বেজে ওঠায় বিরক্ত বোধ করলেন। রিসিভারের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন, শান্ত ভঙ্গিতে সেটীতে হেলান দিয়ে টিউনিক-এর দুটো বোতাম খুলল রানা। 'হ্যাঁ, কি ব্যাপার?' টেলিফোনে জানতে চাইলেন ক্যাপটেন।

ক্রনোমিটারের ওপর চোখ বোলাল রানা। ষাট সেকেন্ড পর জিরো আওয়ার। ক্যাপটেন লোকটাকে এক অর্থে পছন্দই করছে ও। স্টুয়ার্ড বেয়াদবি করায় কর্নেলের মর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে ভেবে সেটা পুষিয়ে দেয়ার জন্যে

আন্তরিকতার কোন অভাব দেখাননি, রানার কাছে বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। তাঁর জন্যে করুণাই হচ্ছে রানার। জাহাজে একটা মিসাইল যখন কম পাওয়া যাবে, বেচারা ক্যাপটেন আর তাঁর পরিবারের সদস্যদের মোসাড ব্যবহার করবে ফুটবল প্র্যাকটিসের কাজে।

ক্যাপটেনের চেহারা দেখে সতর্ক হয়ে গেল রানা। খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। টিউনিকের ভেতর একটা হাত ভরল ও।

'এখুনি আসছি আমি।' রিসিভার রেখে রানার দিকে তাকালেন ক্যাপটেন, চোখে-মুখে বিহ্বল একটা ভাব।

'কোন সমস্যা, ক্যাপটেন?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বললেন ক্যাপটেন, গলার আওয়াজ বেসুরো। 'আমার ফার্স্ট অফিসার তারেক আজাম বলছেন যার যার নির্দিষ্ট পোস্টে মেরিনরা নেই। সাধারণ নিয়ম হলো রাত্রে ডিউটি করার সময় দু'ঘণ্টা পরপর ব্রিজে এসে রিপোর্ট করবে। শেষবার রিপোর্ট করেছে একটা পনেরোতে। তারপর আর আসেনি।' মাথায় ক্যাপ পরে চেয়ার ছাড়লেন। 'গুডনাইট, কর্নেল। সময়টা আপনার সঙ্গে দারুণ উপভোগ করলাম। কাল হয়তো আবার...' বিনয়ের সঙ্গেই বিদায় করছেন, তবে দ্বিধায় ভুগছেন না। ঘুরে দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

পিছন থেকে রানা বলল, 'ক্যাপটেন।'

ইসরায়েলি ক্যাপটেন ঘুরলেন। রানা দাঁড়িয়েছে, রিভলভারটা তাঁর বুকে তাক করা।

প্রথমে রিভলভারটা দেখলেন ক্যাপটেন, তারপর চোখ তুলে রানার মুখে তাকালেন। মুখ খুলে যাচ্ছে, যেন কিছু বলতে যাচ্ছেন।

'কোন কথা নয়, ক্যাপটেন।' সরে দাঁড়াল রানা। 'সেটীতে বসুন, হাত দুটো পকেটে ভরে। বিশ্বাস করুন, কথা না শুনলে এখুনি আপনি খুন হয়ে যাবেন।'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, যেন একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে এলেন ক্যাপটেন। ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে ধপ করে বসে পড়লেন সেটীতে। তার দিকে মুখ করে ডেস্কের কোণায় বসল রানা। 'এখন আমরা অপেক্ষা করব।'

'ক্যাপটেন!' কেবিনের বাইরে থেকে ডাকল কেউ। নওশাদের গলা চিনতে পারল রানা।

'কাম ইন,' বলল ও।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল নওশাদ। ঢুকেই কেবিনের পরিস্থিতি বুঝতে পারল। 'ব্রিজ দখল করতে হলে ওখানে তোমাকে ওদের দরকার,' বলল সে। 'জিরো আওয়ারে আমার এখানে আসার কথা... '

'জানি,' ডেস্ক থেকে নেমে পড়ল রানা। 'ক্যাপটেন ভদ্র মানুষ, তবে কোন ঝুঁকি নেবে না—কোন রকম চালাকি করতে দেখলেই গুলি করবে। ভেতরে ওদের কেউ যদি ঢুকে পড়ে, বেরুতে দেবে না। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। ওরা ব্রিজের নিচে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ব্রিজ হাউজের দরজা খুলে গেল, মই বেয়ে তরতর করে নেমে আসছে এক লোক।

সাদাত, মোস্তফা ও জানশেরের সঙ্গে এই মাত্র যোগ দিয়েছে রানা। মইয়ের নিচে পা ফেলতেই লোকটার হাঁটুতে উল্টো করে ধরা রিভলভার দিয়ে প্রচণ্ড একটা বাড়ি মারল সাদাত, একই সঙ্গে তার কানের পাশে ঘুসি মারল রানা। লোকটা কোন শব্দ করেনি, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে রানা, বাকি তিনজন ওর পিছনে।

রাডার স্ক্রীনটা ব্রিজের পোর্টসাইডে, সেটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফার্স্ট অফিসার তারেক আজাম। স্টারবোর্ড উইং-এর দরজা বিস্ফোরিত হতে ঝট করে ঘুরল সে, দেখল কালো ড্রেস পরা এক লোক উজি হাতে ছুটে আসছে তার দিকে। ভেতরে আরও তিনজনকে ঢুকতে দেখে হাঁ হয়ে গেল সে। তাদের একজন হেলমসম্যানের ঘাড়ে রিভলভার চেপে ধরল। ঠিক সচেতনভাবে নয়, অভ্যাসবশতই, ব্রিজ টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল আজাম।

'না!' গর্জে উঠল মোস্তফা।

স্থির হয়ে গেল ফার্স্ট অফিসার। দেখল আগন্তুকদের একজন হেলমসম্যানকে সরিয়ে দিয়ে হেলম-এর দায়িত্ব নিল।

বাইরের ডেকে ভারী কিছু একটা পতনের আওয়াজ শুনে একটা ঝাঁকি খেলেন ক্যাপটেন বেন দাইয়ান।

'আপনার কোন মাথাব্যথা নয়,' নরম সুরে বলল নওশাদ। 'স্রেফ...'

বাইরের প্যাসেজে ত্রস্ত পদশব্দ। চোখের কোণ থেকে পর্দা ফেলা দরজায় আকস্মিক কিছু নড়ে উঠতে দেখল নওশাদ। তার প্রতিক্রিয়াকে নির্ভেজাল কন্ডিশনড রিফ্লেক্সই বলতে হবে। অনেকটা নাচের ভঙ্গিতে ডেস্ক থেকে নেমে কেবিনের মেঝেতে একটা হাঁটু গাড়ল, উজিটা দু'হাতে ধরেছে, গুলি করল পরপর দুটো। পাক খেলো কেউ একজন, পর্দাটাকে নিজের গায়ে জড়াচ্ছে। টান পড়ল পর্দায়, ফলে সেটা খসে এল রিং থেকে। পর্দায় মোড়া শরীরটা ভারী বস্তার মত আছড়ে পড়ল কেবিনের মেঝেতে।

আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠলেন ক্যাপটেন, সেটি ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ছেন, ট্রাউজারের পকেট থেকে বেরিয়ে আসছে হাত দুটো।

'না!' হুঙ্কার ছাড়ল নওশাদ।

আতঙ্কে চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম, মেঝে থেকে দৃষ্টি ফিরে এনে নওশাদের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। উজির মাজল মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে, সরাসরি তাঁর কপালের ওপর তাক করা। 'ওহ্ গড! ওহ্ গড!' দু'হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

নওশাদের চোখ-মুখ কিছু বলছে না, তবে ক্যাপটেনের প্রতিক্রিয়া বিস্মিত করল তাকে। লোকটার যেন অপূরণীয় কোন ক্ষতি হয়ে গেছে।

ইসরায়েলি এঞ্জিনিয়ার অফিসার ও দু'জন গ্রিজার পিছু হটছে, একটা বাল্কহেডে পিঠ ঠেকতে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাতদুটো মাথার পিছনে তোলা। তাদের সামনে জুবায়ের, হাতে উজি। তার পিছনে ফিফটিন-হানড্রেড-বিএইচপি সালজার মেরিন ডিজেল নিয়মিত ছন্দে গর্জন করছে। এঞ্জিনের উল্টোদিকে জামালু গজ আর

কন্ট্রোলে চোখ বোলাচ্ছে। বাখারা, মাথার ওপর ঘড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, এঞ্জিন রুম টেলিগ্রাফের পাশে উত্তেজনায় টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে। সময় এখন জিরো-থ্রী-থারটি-ফাইভ।

অকস্মাৎ টেলিগ্রাফ ইন্ডিকেটর 'ফুল' থেকে 'হাফ' স্পীড অ্যাহেড-এ নেমে এল, পরমুহূর্তে ফিরে গেল আবার 'ফুল'-এ।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বাখারা, টেলিফোন তুলে যোগাযোগ করল ব্রিজের সঙ্গে। 'বাখারা।'

জবাব দিল জানশের। 'খবর ভাল।'

টেলিফোন রেখে দিল বাখারা। আগে থেকে ঠিক করা সঙ্কেতে কোন ভুল হয়নি। হেঁটে এসে জুবায়েরের কাঁধে টোকা দিয়ে ইঙ্গিত করল সে।

সামনে দাঁড়ানো লোক তিন জনের দিকে হাতের উজি তুলল জুবায়ের। হিব্রু ভাষায় নির্দেশ দিল, 'মই বেয়ে ক্যাটওয়াকে ওঠো!'

উজির গুঁতো খেয়ে মই বেয়ে উঠল তারা। ক্যাটওয়াকে, এঞ্জিন রুম দরজার পাশে, অপেক্ষা করছে শিরিন, তার হাতেও একটা উজি। লোক তিনজন ইতস্তত করায় সে-ও উজি দিয়ে তাদের পিঠে খোঁচা মারল। তারপর তাদের পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল প্যাসেজওয়েতে।

রানার স্পষ্ট নির্দেশ আছে—বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই ক্রুদেরকে তালার ভেতর বন্দী করতে হবে।

প্যাসেজের শেষ মাথায় সাদাত, রাহমানভ ও সোলায়মানের সঙ্গে দেখা হলো ওদের। ওরাও বিমূঢ় একদল ক্রুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 'কোনও সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল শিরিন।

মাথা নাড়ল সাদাত। 'পানির মত সহজ। তোমার?'

'বিলিভ ইট অর নট, ব্যাপারটা আমি উপভোগ করছি। আমার লীডার কোথায়, মাসুদ রানা?'

'ব্রিজে।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করল শিরিন।

ইসরায়েলিদের তিন গ্রুপে ভাগ করল ওরা। লোয়ার ব্রিজের সেলুনে নিয়ে যাওয়া হলো অফিসারদের, বাইরে থেকে তালা দিয়ে দরজায় একজনকে পাহারায় রাখা হলো। খালি একটা কেবিনে কুক আর বোসানকে ঢোকানো হলো। বাকি ক্রুদের নিয়ে যাওয়া হলো হসপিটালে। কোথায় কে পাহারায় থাকবে বলে দিয়ে হুইলহাউসে উঠে এল সাদাত, রিপোর্ট করবে রানাকে।

চার্টরুম থেকে বেরিয়ে এল মোস্তফা। জানশেরের পাশে দাঁড়াল। 'এখনকার হেডিং বলো, জানশের।'

'ওহ্-নাইন-ওহ ডিগ্রীজ ট্রু।'

'এই কোর্সেই থাকো,' বলে রাডার সেটের সামনে চলে এল মোস্তফা। রাডার চেক করছে সে, এই সময় বাইরে থেকে হাসান আর চার্ট রুম থেকে রানা একসঙ্গে ব্রিজে ঢুকল।

'মাসুদ ভাই, নিচের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে,' রিপোর্ট করল হাসান।

'কোন ঝামেলা হয়নি তো?'

মাথা নাড়ল হাসান। 'যাকে যেখানে চেয়েছিলেন, তাকে ঠিক সেখানেই আটকে রাখা হয়েছে।'

'গুড। এবার টহল শুরু করো। যত লোক লাগে লাগুক, জাহাজের প্রতি ইঞ্চি কাভার করা চাই। ওদের একজনও যেন মুক্ত না থাকে। একজনও না!'

হাসান মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে যেতে ব্রিজ টেলিফোনটা হাতে নিল রানা। 'নওশাদ, আমি নামছি। ট্রিগারে পেঁচানো আঙুলটাকে বশে রাখো।'

ডেস্কের কিনারায় বসে ক্যাপটেন বেন দাইয়ানকে দেখছে নওশাদ। মেঝেতে পড়ে থাকা পর্দা মোড়া শরীরটার পাশে উবু হয়ে বসে নিঃশব্দে কাঁদছেন তিনি। ভেতরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল রানা। 'কি ঘটল?'

'রেডিও অপারেটরকে আমি গুলি করেছি।'

কথা না বলে ক্যাপটেনের পিছনে চলে এল রানা, উঁকি দিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা শরীরটা দেখল। বিষণ্ন দেখাল ওকে, নওশাদের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। 'একজন মহিলাকে তুমি গুলি করলে?'

'আমার কিছু করার ছিল না।' নওশাদ গম্ভীর। 'বাইরে থেকে কেবিনের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিল। পর্দা নড়ে ওঠায় গুলি করি আমি। চেক করব, সে-সময় আমার হাতে ছিল না। উনি ক্যাপটেনের স্ত্রী।'

এক সেকেন্ডের জন্যে চোখ বুজল রানা। তারপর ক্যাপটেনের দিকে তাকাল। স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন দাইয়ান, বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন। ভদ্রমহিলা চোখ বুজে হাঁপাচ্ছেন। তার পাশে হাঁটু গাড়ল রানা। বাম পাশের কলার বোন-এর ঠিক নিচে থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। দ্বিতীয় ক্ষতটা অনেক নিচে, ওয়েস্টলাইনের ঠিক কিনারায়।

রানার দিকে তাকালেন ক্যাপটেন, মুখ ঝুলে পড়েছে, চোখে করুণ আর্তি। তারপর অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হলেন। বলছেন, এখুনি তাঁর স্ত্রীকে তীরে নামিয়ে দিতে হবে, তা না হলে তিনি উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারা যাবেন।

নওশাদ কঠিন সুরে বলল, 'অসম্ভব।'

রানাও মাথা নাড়ল। তবে চিন্তা করছে।

'সেক্ষেত্রে আমার স্ত্রীকে হসপিটালে পাঠান, প্লীজ!' কাতর অনুরোধ করলেন ক্যাপটেন।

নওশাদের দিকে তাকাল রানা, সে মাথা নাড়ল।

সিধে হলো রানা। 'শিরিনকে ডাকো, তার ফার্স্ট এইডের ওপর ট্রেনিং নেয়া আছে।'

ক্যাপটেন প্রতিবাদ জানালেন। 'আপনাদের কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। আমার স্টুয়ার্ডকে ডাকুন, ফার্স্ট এইডে তারও ট্রেনিং নেয়া আছে।'

'স্টুয়ার্ড লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না,' নওশাদকে বলল রানা। 'তবু তাকে

নিয়ে এসো। ফিরে এসে রেডিওর দায়িত্ব নেবে তুমি। কেবিনের বাইরে আমি একজনকে পাহারায় থাকতে বলব।'

ডেস্ক থেকে নামতে যাবে নওশাদ, বাইরের প্যাসেজ থেকে ধস্তাধস্তির আওয়াজ ভেসে এল। পরমুহূর্তে হোঁচট খেতে খেতে কেবিনে ঢুকল একজন ইসরায়েলি। পিছু নিয়ে সাদাতও। 'এই বানচোত একটা পোর্টহোল থেকে টর্চ জ্বেলে সিগন্যাল দিচ্ছিল!'

'সর্বনাশ!' চমকে উঠল রানা। 'কোনও সাড়া পেয়েছে?'

'মনে হয় না,' চেহারা দেখে মনে হলো সাদাত নিশ্চিত নয়।

'মনে হয় না মানে কি?' প্রায় গর্জে উঠল রানা।

'বাইরে অনেক জাহাজ, রানা,' শান্ত সুরে বলল সাদাত। 'কত রকম আলো জ্বলছে আর নিভছে, কিভাবে বুঝব...'

'সেজন্যেই প্রথমে নিশ্চিত হতে বলেছিলাম, গুনে দেখতে হবে ক্রুদের সবাইকে আটক করা হলো কিনা। এরকম ভুল হতে থাকলে দেখতে পাবে আমরা সবাই পানিতে খাবি খাচ্ছি।' নওশাদের দিকে তাকাল রানা। 'তুমি ওকে ইন্টারোগেট করো। ওর নাম সুরেলি, ক্যাপটেনের স্টুয়ার্ড। ওর যে সাহস আর বুদ্ধি, এই পদে একেবারেই মানায় না। জেরা করে দেখো আসল পরিচয়টা বের করতে পারো কিনা।'

সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সুলেরি। তার মুখ কয়েক জায়গায় কেটে গেছে, ক্ষতগুলো থেকে অল্প অল্প রক্ত গড়াচ্ছে।

'সাদাত,' বলল রানা। 'বাইরে একজনকে পাহারায় রাখো। সুলেরি কোন রকম গোলমাল করলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। ওর অপরাধের শাস্তি ক্যাপটেন আর তাঁর স্ত্রীকেও বহন করতে হবে। তাঁদেরও গুলি করা হবে।' নওশাদের দিকে ফিরল। 'রেডিও। জরুরী কিছু শুনলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে। আর এক ঘণ্টা পর সূর্য উঠবে। আমি চাই দিনের আলোয় জাহাজটাকে যেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দেখায়। আমাদেরকে আরও অনেক দূর যেতে হবে।'

ছয়

গালফ অভ এডেন-এর শিপিং লেনগুলোয় ট্র্যাফিকের ভিড় লেগে আছে। সকালের প্রথম রোদে একটা সুইডিশ প্যাসেঞ্জার লাইনারের দুধ সাদা উপরিভাগ আর উজ্জ্বল নীল চিমনি ঝলমল করছে, বিভিন্ন আকৃতির জাহাজগুলোকে পাশ কাটিয়ে রাজকীয় একটা ভঙ্গিতে ছুটে চলেছে নিজের গন্তব্যে। তরল সোনা ভর্তি ট্যাংকারগুলো পার্শিয়ান গালফ থেকে বেরিয়ে লোহিত সাগর ও সুয়েজ ক্যানেলের দিকে যাচ্ছে। কন্টেইনার শিপও সংখ্যায় কম নয়, বেশিরভাগই পুব দিকে মুখ করা, যাচ্ছে ফার ইস্ট। প্রকাণ্ড ক্যারিয়ারগুলোর গন্তব্য ইউরোপ।

এত সব জাহাজের ভেতর দিয়ে গোল্ডামেয়ার পুবদিকের কোর্স ধরে দশ নট স্পীডে এগোচ্ছে। ঢেউগুলো তেমন বড় নয়, অশান্তও নয়, বোর সঙ্গে সংঘর্ষে

পানির বিস্ফোরণ ছড়িয়ে পড়ায় মুক্তোর মত লাগছে দেখতে।

সাড়ে ন'টা বাজতে আবহাওয়া বেশ গরম হয়ে উঠল। ধাতব কিছুতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি হাত রাখা যাচ্ছে না। সাগরে প্রতিফলিত রোদ চোখের জন্যে পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। জাহাজের পোর্টসাইডে ঘন ঘন ডিগবাজি খাচ্ছে একদল ডলফিন।

সোলায়মান, গায়ের মেরিন ইউনিফর্ম ঘামে ভিজে গেছে, ডান কাঁধে উজি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রেইলের কাছে; যেন খানিকটা ঈর্ষা নিয়েই ডলফিনগুলোর খেলা দেখছে। তার ওপরে, ব্রিজের উইং থেকে, চোখে বিনকিউলার ধরে মোস্তফা তাকিয়ে আছে জাহাজের পিছন দিকে, গভীর মনোযোগের চিহ্ন ফুটে উঠেছে কপালের ভাঁজে।

'আমার ধারণাই ঠিক,' ভারী গলায় বলল মোস্তফা। 'ওটা একটা ইসলায়েলি কারা-ক্লাস ক্রুজার। সম্ভবত এডেনে এটাকেই আমরা দেখেছিলাম।' চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। হুইলহাউসের ঠিক ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে ও।

'বিপদ?' সরাসরি প্রশ্ন করল রানা।

'সম্ভবত।' হুইলহাউসে ফিরে এল মোস্তফা।

'কেন?'

'দুটো কারণে। "কারা" বা "স্পারটাক" ক্লাস শিপ ইসরায়েলি নেভীতে বহুল ব্যবহৃত জাহাজ। বেন দাইয়ান ন্যাভাল রিজার্ভ-এর একজন ক্যাপটেন। তাছাড়া, এমনও হতে পারে, ওই ক্রুজারের কমান্ডার দাইয়ানকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। বিশেষ করে এটা যদি সত্যি হয় যে এডেনে দুটো জাহাজ পাশাপাশি নোঙর করা ছিল। মাঝ সাগরে আবার দেখা হওয়ায় কমান্ডার যদি কাছাকাছি আসতে চান, বন্ধুর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে চান, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

মোস্তফার হাত থেকে বিনকিউলার নিয়ে ব্রিজের উইং-এ বেরিয়ে এল রানা, চোখে তুলে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল। লাফ দিয়ে কাছে চলে এল ক্রুজার। এখনও পাঁচ মাইল পিছনে ওটা। তবে স্পীড গোল্ডামেয়ারের চেয়ে অনেক বেশি। অত্যন্ত শক্তিশালী জাহাজ, বুনো ঘোড়ার মত টগবগে একটা ভাব আছে। গোল্ডামেয়ারকে যদি শিকার ভেবে থাকে, ওদের কপালে খারাবি আছে।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে হুইলহাউসে ফিরে এল রানা। 'হ্যাঁ, বিপদ,' শান্ত গলায় বলল ও।

ঝট করে রানার দিকে ফিরল জানশের, হেলম ধরে আছে। 'কি বিপদ, রানা?'

'পিছনে তেড়ে আসছে ইসরায়েলি ক্রুজার,' বলে ব্রিজ টেলিফোন তুলে রেডিও রূমের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল নওশাদ।

'ওয়াইটি-তে কিছু পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'স্রেফ স্বাভাবিক ট্র্যাফিক। কেন?'

'যে-কোন মুহূর্তে নতুন কিছু শুনতে পাবে। পিছনে একটা ইসরায়েলি ক্রুজার। যোগাযোগ করলে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে কথা বলবে। আমাকে জানাতে

দেরি কোরো না।'

'নো একঘেয়েমি, হাহ্?' বিড়বিড় করল নওশাদ। 'ঠিক আছে, আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

ফোন রেখে দিয়ে ব্রিজ উইন্ডো দিয়ে খালি ফোরডেকে তাকিয়ে থাকল রানা। বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশি কিছু করার নেই ওর। ক্রুজার কমান্ডার যদি গোল্ডামেয়ারকে থামতে বলেন, তিনি যদি ক্যাপটেন দাইয়ানের সঙ্গে গল্প করার জন্যে ক্রুজারে ডাকেন বা নিজেই গোল্ডামেয়ারে আসতে চান, বিপদ এড়ানো কঠিন হবে। জাহাজ হাইজ্যাক করার সময় বেশ ক'টা লাশ পড়েছে ইসরায়েলিদের, সেগুলো ওরা দেখে ফেললে মিশনের এখানেই সমাপ্তি।

হুইলহাউসে ঢুকল হাসান। হাতের একজোড়া মগ থেকে বাষ্প উঠছে। একটা মগ রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'শিপ চেক করলাম, মাসুদ ভাই। সবাই যে যার পজিশনে আছে, জানে কাকে কি করতে হবে।'

অন্যমনস্ক, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। জানালার গোবরাটে মগটা রাখল ও। চোখে আকস্মিক একটা নড়াচড়া ধরা পড়েছে। ফোরডেক ধরে সাদাত আর জুবায়ের দ্রুত হাঁটছে, হাতে টিন ভর্তি রঙ ও ব্রাশ।

'ম্লান হয়ে যাওয়া রঙ উজ্জ্বল করা হবে,' বলল হাসান। 'ভাবলাম ডেকে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে দেখলে কারও মনে কোন সন্দেহ জাগবে না।'

আবার ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ক্রুজার থেকে একটা হেলিকপ্টার উঠছে,' হুইলহাউসে মোস্তফার চিৎকার ভেসে এল।

উইং-এ বেরিয়ে এসে পিছনদিকে তাকাল রানা। এরইমধ্যে ক্রুজারের ফ্যানটেইল থেকে আকাশে উঠে পড়েছে কপ্টারটা, রোদ লাগায় জোড়া রোটর রূপোর চাকতির মত লাগছে। কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল ওটা, তারপর নাক ঘুরিয়ে সোজা রওনা হলো এদিকেই। হার্টবিট বেড়ে গেছে সবার। কারও চোখে পলক পড়ছে না।

সরাসরি গোল্ডামেয়ারের মাথার ওপর চলে এল সামরিক হেলিকপ্টার। এত নিচে, ক্রুদের সবাইকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। টারবাইনের শব্দে কান পাতা দায় হয়ে উঠল। তারপর, এক মুহূর্ত স্থির থেকে, কোর্স বদলে পুব দিকে ছুটল ওটা।

আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল মোস্তফা। হঠাৎ স্বস্তি বোধ করায় শরীরটা এত হালকা হয়ে গেছে, মনে হলো অসুস্থ হয়ে পড়বে। কারণ যা-ই হোক, ওদের মৃত্যুদণ্ড আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

রানা ঘাড় ফিরিয়ে ক্রুজারটার দিকে তাকাল। এখন সেটা আর মাত্র দু'মাইল দূরে। আগের মতই নির্দিষ্ট কোর্স ধরে আসছে। ব্রিজে ফিরে এসে নওশাদের সঙ্গে যোগাযোগ করল ও। 'রিপোর্ট করো।'

'এক সেকেন্ড,' নওশাদের গলা শান্ত। 'খুব কাছাকাছি কোথাও থেকে সরল ভাষায় কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে। আশপাশে কোন হেলিকপ্টার আছে নাকি?'

'ক্রুজার থেকে এইমাত্র উঠেছে একটা। পুবদিকে গেল।'

'ও, তাহলে ঠিক আছে'। কেউ একজন পাইলটকে সাবধান করে দিয়ে বলছে, খুব কাছাকাছি যেয়ো না, বা উসকানি দিয়ো না। যতটুকু বুঝতে পারছি, আশপাশে মিশরীয় ও সৌদি যুদ্ধ জাহাজ আছে। ইসরায়েলি ক্রুজারের কমান্ডার ওগুলোয় চোখ বোলাবার জন্যে হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে।'

হ্যান্ডসেট রেখে দিল রানা। কি ঘটছে হাসানকে ব্যাখ্যা করল ও। হুইলহাউসে ঢুকল মোস্তফা, সোজা এগিয়ে রাডার সেটের সামনে থামল। তার পাশে চলে এল রানা ও হাসান।

'সম্ভবত এটা,' স্ক্রীনের ওপরের কিনারায় আঙুল তাক করল সে, সেখানে ম্লান সবুজ একটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে। 'গালফ থেকে প্রায় চব্বিশ মাইল দূরে।'

ব্রিজে টেলিফোন বাজল। হ্যান্ডসেট তুলল মোস্তফা। কয়েক সেকেন্ড শুনল, তারপর রানার দিকে তাকাল। 'বাখারা,' বলল সে। 'এঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দিয়েছে। স্পীড সাত নটে নামিয়ে আনতে চাইছে সে।'

মোস্তফার হাত থেকে হ্যান্ডসেট নিয়ে বাখারার সঙ্গে সরাসরি কথা বলল রানা, 'সমস্যাটা খুলে বলো।'

'ফুয়েল ইনজেক্টর বুজে গেছে,' বলল বাখারা। 'পরিষ্কার করতে হবে।'

'না থেমে কাজটা করা যায় না?'

'যায়, তবে সেক্ষেত্রে এখুনি রেভোলিউশন কমিয়ে আনতে হবে।'

মোস্তফার দিকে ফিরল রানা। 'তুমি কি বলো, ক্যাপটেন?'

'ক্রুজার পাশ কাটিয়ে চলে যাবার আগে স্পীড কমালে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।' মোস্তফা চিন্তিত।

হান্ডসেটটা তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'তুমি ক্যাপটেন।'

হুইলহাউসের দরজায় এসে বাইরে তাকাল ও। ইসরায়েলি ক্রুজার এই মুহূর্তে মাত্র একশো গজ দূরে, কোর্স বলে দিচ্ছে দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। ক্রুজারের ডেকে বসানো কামানগুলো চকচক করছে রোদে। আকৃতি দেখে মিসাইলগুলোও চেনা যাচ্ছে, তারপুলিনে ঢাকা। বিশাল এই একটা ক্রুজারই গালফ অভ এডেন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে যথেষ্ট। ইসরায়েলিরা এই ক্রুজার থেকে হামলা শুরু করলে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেরই তেলখনিগুলোয় আগুন জ্বলে উঠবে, বন্ধ হয়ে যাবে ইলেকট্রিসিটি।

গোল্ডামেয়ারের পাশে চলে এল ক্রুজার, মেইনমাস্ট-এর ওপর রাডার ডিশ নিয়মিত ও নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরছে, চৌকো চিমনি থেকে ছাই রঙা ধোঁয়া উঠছে সামান্য। ডেকে খুব কম লোকই হাঁটাচলা করছে।

ব্রিজের নিচে, হাসানের নির্দেশে, অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোলায়মান। তার কাছে অস্ত্র আছে, তবে দেখা যাচ্ছে না। ফোরডেকের এক প্রান্তে রয়েছে সাদাত ও জুবায়ের, হাতে ব্রাশ, কাজ থামিয়ে তাকিয়ে আছে ক্রুজারের দিকে। সেটা গোল্ডামেয়ারকে পাশ কাটিয়ে গেল দেখে মোস্তফা এঞ্জিন রূমকে স্পীড কমানোর নির্দেশ দিল।

এক নম্বর হোল্ডে, প্রকাণ্ড একটা খোলা ক্রেইট-এর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে

জিয়া হাসান। কাছেই আরেকটা ক্রেইট, সেটার ওপর শুয়ে আছে শক্তিশালী একটা টর্চ, আলোর টানেলটা তার কাজের জায়গায় তাক করা। ধীরেসুস্থে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, একটা আরপিজি-সেভেন ওঅরহেডের বেস-এ পুটিং-এর মত দেখতে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ লাগাল সে। তারপর নরম বিস্ফোরকের ভেতর একটা ডিটোনেটর ঢোকাল—ডিটোনেটর থেকে বেরিয়ে আছে এক প্রস্থ কর্ড। কাজটা শেষ হতে দ্বিতীয় আরপিজি-সেভেন ওঅরহেড প্রথমটার ওপর চাপাল, তারপর বন্ধ করে দিল ক্রেইটের ডালা।

ধীরে ধীরে সিধে হলো হাসান, মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ থেকে ঘাম ঝরাল, আড়মোড়া ভেঙে ঘাড় আর কাঁধের আড়ষ্ট ভাব দূর করল।

কপালে ভাঁজ, চারদিকে চোখ বোলাল হাসান। রানার নির্দেশেই এক নম্বর হোল্ড থেকে বিস্ফোরক বসাবার কাজটা শুরু করেছে সে। গোল্ডামেয়ারের ক্যাপটেনের দায়িত্ব পালন করছে মোস্তফা, তার চোখ ফাঁকি দিয়ে ব্রিজ থেকে কিছু কাগজ-পত্র সরিয়েছে রানা। হিব্রু ভাষায় লেখা একটা তালিকা পাওয়া গেছে, নির্দেশটা দেয়ার সময় সেটা হাসানের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে রানা।

এক নম্বর হোল্ডে শুধু ওঅরহেড নয়, টন টন লিমপেট ও প্রেশার মাইন, ফিফটিসেভেনএমএম ও থারটি এমএম এইচই শেল, ফাইভ হানড্রেড থারটি থ্রী এমএম টর্পেডো ওঅরহেড ইত্যাদি আরও অনেক কিছু রয়েছে। সবই জমা করা হবে ইসরায়েলের নতুন ন্যাভাল বেস সোকোট্রা দ্বীপে। হাসানের এক পাশে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে রয়েছে আরপিজি রকেট, স্মল-আর্মস অ্যামিউনিশন ও ফসফরাস গ্রেনেড। গম্ভীর এক চিলতে হাসি ফুটল হাসানের ঠোঁটে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে মারণাস্ত্রের মুখে কোণঠাসা করার ষড়যন্ত্র করেছে ইসরায়েল। তাদের প্রস্তুতিতে কোন খুঁত নেই। কিন্তু শোভন চৌধুরী, রূপক মির্জা ও আলি আব্বাসকে খুন করে গোক্ষুরের লেজে পা দিয়ে ফেলেছে তারা। সেই গোক্ষুর, মাসুদ রানা, ইসরায়েলিদের এই ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবে না।

হোল্ডের ডেকে, হাসানের পাশে, পড়ে রয়েছে হ্যান্ডগ্রিপটা, ভেতরে এক্সপ্লোসিভ ও ইকুইপমেন্ট ঠাসা। দাহরান থেকে যে রাকস্যাক পেয়েছিল ওরা, তার ভেতরই ছিল হ্যান্ডগ্রিপটা। ভেতরে টর্চের আলো ফেলে কালো টেপের একটা রোল বের করল সে, কর্ড ধরে এগোল—প্রতিটি ক্রেইটে টেপ দিয়ে আটকাল সেটা। কাজটা সাবধানে করতে হলো, কর্ডটা যাতে কারও চোখে ধরা না পড়ে।

ক্রু মেস টেবিলে ঝুঁকে রয়েছে সোলায়মান, এক হাতে কফি ভর্তি মগ, আরেক হাতে সিগারেট। উজিটা টেবিলের পায়ায় ঠেস দিয়ে রেখেছে। যতবার চুমুক দিচ্ছে কফিতে, চেহারা আরও গম্ভীর হয়ে উঠছে। উল্টোদিকের দেয়ালে ইসলায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ারের ছবি, সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সোলায়মানও কটমট করে তাকাচ্ছে সেদিকে।

ভেতরে ঢুকে টেবিলে, সোলায়মানের মুখোমুখি বসল সাদাত। উজিটা টেবিলের ওপর রেখে পট থেকে মগে কফি ঢালল। সোলায়মান মন্তব্য করল, 'খাচ্ছ খাও, তবে এ জিনিস কফি নয়—বগলের ঘাম বলতে পারো, তাও গরিল্লার।'

'মূড এত খারাপ কেন?' হেসে উঠে জানতে চাইল সাদাত। 'এদিকে সব ঠিকঠাক আছে তো?'

'তা আছে।'

'হাসানকে দেখেছ?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সাদাত।

'বেশ কিছুক্ষণ দেখিনি। কেন?'

'এমনি, কৌতূহল।'

'ক্লান্ত হয়ে কোন কেবিনে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে,' বলল সোলায়মান।

মাথা নাড়ল সাদাত। 'না। চেক করে দেখেছি আমি।'

'তাহলে হয়তো জাহাজ থেকে পানিতে পড়ে গেছে।' কৌতুক নয়, বিরক্তি প্রকাশ করছে সোলায়মান।

টেবিলে কনুই রেখে তার দিকে ঝুঁকে পড়ল সাদাত। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়, আমাদের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড স্রেফ নিখোঁজ হয়ে যাবে?'

'কে বলল হাসান নিখোঁজ হয়ে গেছে?'

'আমি বলছি,' ফিসফিস করল সাদাত। 'সে কোন কেবিনে নেই, ব্রিজে নেই, ডেকে নেই, কিংবা এঞ্জিন রূমেও নেই। রানাকে যখন রিপোর্ট করলাম, সে শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। অর্থাৎ, এ-বিষয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে নিষেধ করল, তাই না? এবার বলো, ব্যাপারটা কি স্বাভাবিক?'

সোলায়মান আরও গম্ভীর হলো। 'কি বলতে চাও তুমি?'

সাদাতের উত্তর দেয়া হলো না, তার আগেই বড় হয়ে উঠল সোলায়মানের চোখ। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন দিকে তাকাল সাদাত। ক্রু মেসের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে শিরিন, হাতে রিভলভার, পাশে ইসরায়েলি স্টুয়ার্ড সুলেরি। 'ও এখানে কি করছে?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল সাদাত।

'হসপিটাল ডিসপেন্সারী থেকে কিছু ওষুধ নিতে এসেছে,' জবাব দিল শিরিন।

'কেন?'

'ক্যাপটেনের স্ত্রী, রেডিও অপারেটর, আহত হয়েছেন। সম্ভবত মারা যাচ্ছেন।'

'ক্যাপটেনের ওপর নজর রাখছে কে?'

'নওশাদ।'

'ঠিক আছে। তবে এই শালার ওপর কড়া নজর রাখো। ওকে দেখলেই আমার ঘাড়ের পিছনে চুল দাঁড়িয়ে যায়। আমি লীডার হলে, প্রথমেই ওকে পানিতে ফেলে দিতাম।'

পাঁজরে রিভলভারের গুঁতো দিয়ে সুলেরিকে নির্দেশ দিল শিরিন। 'মুভ!'

প্যাসেজওয়ে ধরে জাহাজের পিছন দিকে যাচ্ছে ওরা।

কাঁধে উজি, হসপিটালের বাইরে পাহারা দিচ্ছে রাহমানভ, কাজটা একঘেয়ে লাগায় সরু গোঁফের একটা প্রান্ত ধরে বারবার মোচড়াচ্ছে। সুলেরিকে দেখে কাঁধ থেকে অস্ত্র নামাল। শিরিনের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল—সার্বদের সঙ্গে বসনিয়ান মুসলমানদের যুদ্ধের সময় ওখানে গেরিলা কমান্ডার হিসেবে কাজ করেছে শিরিন, তার অধীনে লড়াই করেছে সে। সুলেরির কি দরকার বলল শিরিন, শুনে হসপিটালের তালা খুলে দিল রাহমানভ, হিব্রু

ভাষায় গলা চড়িয়ে সাবধান করে দিল–ক্রুরা যেন দরজার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। তারপর লাথি মেরে কবাট খুলল।

হসপিটালের ভেতরটা অন্ধকার, ভেতর থেকে ঘামের গন্ধ এসে আঘাত করল নাকে। সাগরে নানা ধরনের জাহাজ আসা-যাওয়া করছে, ক্রুরা ওগুলোকে সঙ্কেত দিতে পারে, তাই সমস্ত লাইট ফিটিং আগেই ভেঙে ফেলা হয়েছে। শুধু প্যাসেজে আলো আছে, তার আভায় কয়েকটা অস্পষ্ট মুখ দেখা গেল।

পিঠে রিভলভারের গুঁতো দিয়ে সুলেরিকে ভেতরে ঢোকাল শিরিন, তারপর বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

মিনিট দুয়েক নিজেদের মধ্যে কথা বলল শিরিন ও রাহমানভ। তারপর ভেতর থেকে হসপিটালের দরজায় টোকা পড়ল।

এক পা পিছিয়ে এসে উজিটা বাগিয়ে ধরল রাহমানভ, দরজার হাতল ধরে ঘোরাতে শুরু করল শিরিন। অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হয়ে ভেতর দিকে খুলে গেল কবাট দুটো, সেই সঙ্গে হ্যাঁচকা টান খেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল শিরিন। কয়েক জোড়া হাত দেখতে পেল রাহমানভ, শিরিনকে আরও ভেতরে টেনে নিল। প্রায় একই সময়ে কেউ একজন গ্লাস ভর্তি অ্যামোনিয়া ছুঁড়ে দিল রাহমানভের মুখে। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল সে, পিছু হটে ধাক্কা খেলো একটা বাল্কহেডে। প্রকাণ্ডদেহী একজন গ্রিজার লাফ দিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এসে ঝেড়ে লাথি মারল রাহমানভের পেটে। কুঁজো হয়ে গেল রাহমানভ, তার হাত থেকে উজিটা কেড়ে নিল গ্রিজার।

বাইরে ধস্তাধস্তির আওয়াজ পেয়ে ছুটে মেসরুমের দরজায় চলে এল সাদাত, হাতে উজি। সোলায়মানও তাকে অনুসরণ করল। উজি কেড়ে নিয়ে সিধে হচ্ছে গ্রিজার, মেসরুমের দরজায় সাদাতকে দেখতে পেয়ে অস্ত্রটা সেদিকে ঘোরাল। সেফটি অফ করাই ছিল, সাদাতের উজি থেকে এক পশলা বুলেট ছুটল, ঝাঁঝরা করে দিল গ্রিজারের বুক। ঝাঁকি খেতে খেতে বাল্কহেডে সেঁটে গেল শরীরটা। রিফ্লেক্স অ্যাকশন, ট্রিগারে পেঁচানো লাশের আঙুলে চাপ পড়ল, ছুটে এল এক ঝাঁক বুলেট। পিছন দিকে লাফ দিল সাদাত, ধাক্কা খেলো সোলায়মানের গায়ে, দরজার ধাতব ফ্রেম আর কাঠের কবাটে লেগে আরেক দিকে ছুটে গেল বুলেটগুলো।

দরজার বাইরে উঁকি দিয়ে আরেক পশলা গুলি করল সাদাত। হসপিটালের ওদিক থেকে এবার একটা রিভলভার গর্জে উঠল, বুলেটটা বেরিয়ে গেল সাদাতের কানের আধ ইঞ্চি পাশ দিয়ে। ঝট্ করে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে নিল সে। ইঙ্গিতে সোলায়মানকে কাছে ডাকল, বলল, 'করিডরের ওদিকেই ওদেরকে আটকে রাখতে হবে!'

উজির সিলেক্টর টেনে সিঙ্গেল-শটে আনল সোলায়মান, ব্যারেলটা দরজার বাইরে বের করে দিয়ে গুলি করল একটা। উল্টোদিকের বাল্কহেডে ঘষা খেয়ে দিক বদলে ছুটল ওটা। উজির ব্যারেল আরেকটু সোজা করে আবার গুলি করল সোলায়মান। কাউকে লেগেছে বলে মনে হলো না।

হসপিটাল থেকে বেরিয়ে আসছে ক্রুরা, একসঙ্গে জড়ো হয়ে জাহাজের পিছন দিকে ছুটছে, তাদের একজন নিহত গ্রিজারের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল

ডজিটা। রিভলভার যার হাতেই থাকুক, মেসরূমের দরজা লক্ষ্য করে এখনও থেমে থেমে গুলি করছে সে, ফলে করিডরে বেরুতে পারছে না সাদাত ও সোলায়মান।

আফটার ডেক থেকে জুবায়ের দেখল প্যাসেজওয়ে ধরে তার দিকে ছুটে আসছে ইসরায়েলিরা। কোমরের কাছ থেকে গুলি করল সে, প্রথম দফাতেই শেষ করল ম্যাগাজিনের অর্ধেকটা। কাঠের এগজিট ডোর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, কয়েকটা বুলেট ছুটন্ত লোকগুলোর গায়ে বিঁধল। তিনজন সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল, বাকি সবাই যন্ত্রচালিতের মত একযোগে ঘুরে ফিরে যাচ্ছে হসপিটালের দিকে।

শেষ লোকটা হসপিটালে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই রানার ভারী গলা শুনতে পেল সাদাত, প্যাসেজের আরও পিছন থেকে ভেসে এল। 'সাদাত! গুলি থামাও!'

গ্যালি বাল্কহেডে সেঁটে রয়েছে রানা, ঝুঁকি নিয়ে বাঁক থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল প্যাসেজে। শেষ প্রান্তে কয়েকটা লাশ পড়ে রয়েছে। আবার কথা বলল ও। 'সাদাত! জায়গা ছেড়ে নড়ো না। জুবায়ের?'

'আমি আমার জায়গায়,' জবাব দিল জুবায়ের। 'ওদেরকে আমি পিছু হটতে বাধ্য করেছি। ওরা এখন হসপিটালে, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে দরজা।'

ক্রু মেস থেকে সাবধানে বেরিয়ে এসে পিছু হটতে শুরু করল সাদাত ও সোলায়মান, রানার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে।

'সাদা...' কর্কশ একটা আওয়াজ থামিয়ে দিল ওদেরকে। হসপিটালের বাইরে, মেঝেতে পড়ে থাকা লাশগুলোর মাঝখানে, বহুকষ্টে বসার চেষ্টা করছে রাহমানভ। 'ওরা সালমা শিরিনকে বন্দী করেছে। তাঁর রিভলভারটাও এখন ওদের হাতে।'

সাদাত ও সোলায়মানের পিছনে এসে দাঁড়াল রানা, কোমরের কাছে ধরা একটা শটগান। থমথম করছে চেহারা, চোখ দুটো কঠিন। 'রাহমানভকে সরিয়ে আনো,' নির্দেশ দিল ও। 'দরজাটা কাভার দাও। আমি দেখছি বাইরে থেকে কিছু করা যায় কিনা।'

সাদাত ও সোলায়মান রাহমানভকে আনতে যাচ্ছে। পোর্ট-সাইড ডোর টপকে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। নিঃশব্দ পায়ে জাহাজের পিছন দিকে যাচ্ছে।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল রানা। হসপিটালের একটা পোর্টে ওঠার চেষ্টা করছে এক লোক। স্যাৎ করে কাছে চলে এল রানা। পোর্ট থেকে লোকটার মাথা বাইরে বেরুতেই উল্টো করে ধরা শটগান দিয়ে বাড়ি মারল চাঁদিতে। লোকটা কোন আওয়াজ করল না, তবে হসপিটালের ভেতর থেকে ভারী কিছু পতনের শব্দ ভেসে এল। বাল্কহেডের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা, অপেক্ষা করছে। হসপিটালের ভেতর সতর্ক পায়ে হাঁটাচলা করছে ক্রুরা, চাপা স্বরে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছে।

ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে থাকায় সরু একটা রেখা তৈরি হয়েছে, রানা চিন্তা করছে শিরিনকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়। হসপিটাল থেকে ইসরায়েলিরা বেরিয়ে আসবে, তার কোন উপায় নেই। ওরও উপায় নেই ভেতরে ঢোকার। এ-ধরনের পরিস্থিতিকে মেক্সিকান স্ট্যান্ড-অফ বলা হয়। কিন্তু এই অচলাবস্থা দীর্ঘ হতে দেবে না ও। কিছু একটা করতে হবে ওকে। দ্রুত।

কোন উপায়ই কি নেই? মাথার ভেতর ঝড়। সম্ভাব্য সমাধান একের পর এক উঁকি দিচ্ছে মনে, বাতিল হতেও সময় নিচ্ছে না।

প্রথম কাজ শিরিন বেঁচে আছে কিনা জানা। 'শিরিন?' ডাকল রানা।

কয়েক মুহূর্ত কোন শব্দ হলো না। তারপর ভেতর থেকে সুলেরির গলা ভেসে এল। 'তোমাদের মেয়েটা আমাদের হাতে। আমরা মুক্ত হতে না পারলে ওকে মেরে ফেলব। তোমরা আত্মসমর্পণ করো।'

'জানব কিভাবে সে বেঁচে আছে?'

'আমাদের কথা বিশ্বাস করতে হবে।'

'অসম্ভব! শিরিন বেঁচে থাকলে আমি ওর আওয়াজ শুনতে চাই।'

কোন জবাব এল না।

শটগানের ট্রিগারে রানার আঙুল শক্ত হলো। 'ত্রিশ সেকেন্ড সময় দিলাম। এর মধ্যে শিরিনের গলা না পেলে তোমাদের সব ক'টাকে খুন করব আমি। গ্রেনেড বলে একটা জিনিস আছে, ভুলে যেয়ো না।'

দশ সেকেন্ড পার হলো। তারপর পনেরো সেকেন্ড। অন্ধকার থেকে ভেসে এল শিরিনের কণ্ঠস্বর। 'মাসুদ ভাই, আমার মাথায় রিভলভার ধরে আছে একজন। জাহাজের দখল ফিরে না পেলে এরা সত্যি আমাকে মেরে ফেলবে।'

'রিভলভার ধরে আছে...কে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা।

'সুলেরি, স্টুয়ার্ড। সে...' ঠাস করে চড় মারার একটা শব্দ হলো, ব্যথায় ককিয়ে উঠল শিরিন।

'অনেক হয়েছে,' হসপিটাল থেকে বলল সুলেরি। 'আর কোন আলোচনা নয়। আত্মসমর্পণের জন্যে তোমাদেরকে পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হলো।'

মাথা নিচু করে পোর্টটা পার হয়ে আফটার ডেকে বেরিয়ে এল রানা। প্যাসেজওয়েের প্রবেশপথে পাহারায় রয়েছে জুবায়ের। পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্রুত একটা ধারণা দিল রানা। শুধু প্যাসেজ নয়, হসপিটাল পোর্টের ওপর নজর রাখতে হবে তাকে—ওটা দিয়ে কেউ যাতে বেরিয়ে আসতে না পারে।

নার্ভাস দেখাল জুবায়েরকে। 'এর সমাধান কি, রানা?'

'তুমি তোমার কাজ করো, দু'মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি আমি।' মই বেয়ে ওপরের ডেকে উঠে এল রানা। এখানে ডেভিট-এর সঙ্গে ঝুলছে স্টার্ন লাইফবোট। ক্যানভাস কাভার সরিয়ে লাইফবোটে চড়ল ও, প্রতিটি লকার সার্চ করছে। একটু পরই যা খুঁজছিল পেয়ে গেল।

রানার নির্দেশ পেয়ে হসপিটাল পোর্ট-এর নিচে এসে দাঁড়িয়েছে জুবায়ের। রানার উপস্থিতি সে টেরই পেল না। কানের পাশে হঠাৎ ওর গলা পেয়ে চমকে উঠল। ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা, 'কোন শব্দ করছে ওরা?'

একটা ঢোক গিলে মাথা নাড়ল জুবায়ের। তারপর খেয়াল করল রানার হাতে একটা বাক্স। 'কি ওটা, রানা?'

কথা না বলে ডেকের ওপর বাক্সটা রেখে ঢাকনি খুলল রানা। জুবায়ের দেখল লম্বা সিলিন্ডার আকৃতির কয়েকটা জিনিস রয়েছে ভেতরে।

একটা সিলিন্ডার হাতে নিয়ে সিধে হলো রানা। 'ফ্লেয়ার,' ফিসফিস করল ও।

হসপিটাল পোর্ট-এর দিকে একটা আঙুল তাক করে জুবায়েরকে ইশারায় বুঝিয়ে দিল রানা কি করতে যাচ্ছে ও। চওড়া হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জুবায়েরের মুখ। শটগান বাগিয়ে ধরে হসপিটাল পোর্টের এক পাশে পজিশন নিল রানা। ওর ইঙ্গিত পেয়ে ফ্লেয়ারের গোড়া থেকে টেপটা ছিঁড়ে ফেলল। ফ্লেয়ার জ্যান্ত হলো। জুবায়েরও দেরি করল না। বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে আছে, পোর্টের ভেতর ফ্লেয়ারটা ফেলে দিল সে।

বেশ জোরাল একটা শব্দ হলো—পপ্! পরমুহূর্তে হসপিটালের ভেতরটা চোখ-কানা-করা আলোয় ভেসে গেল।

শক্ত করে চোখ বুজে শটগানের ব্যারেলটা পোর্টে ঢোকাল রানা, তারপর ট্রিগার টেনে দিল। ফাঁকা গুলি, ইসরায়েলিদের মাথার ওপর ডেকহেডে লাগল বুলেট। গুলি করে পিছিয়ে আসছে ও, ভেতরে আরও একটা ফ্লেয়ার ফেলল জুবায়ের। এবারও পোর্টে ব্যারেল ঢুকিয়ে ডেকহেডে একটা গুলি করল রানা।

আতঙ্কিত চিৎকার ভেসে এল, পোর্ট থেকে হু-হু করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। জুবায়ের আরও একটা ফ্লেয়ার ফেলল ভেতরে।

'রিভলভার ও উজি, দুটোই বাইরে ফেলে দাও,' গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল রানা। 'তা না হলে এরপর তোমাদের মাথায় গুলি করব।'

'চোখ গেল!' 'মরে গেলাম!' এ-ধরনের কাতর আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল কর্কশ চিৎকার। কেউ নির্দেশ দিচ্ছে, গ্রাহ্য না করে পাল্টা নির্দেশ দিচ্ছে আরেকজন। ছুটোছুটির আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে রানা। তারপর উল্টো করে ধরা উজিটা দেখা গেল পোর্টে। হাত বাড়িয়ে সেটা টেনে নিল জুবায়ের।

'এবার রিভলভারটা!' বলল রানা।

একইভাবে পোর্টে বেরিয়ে এল উল্টো করা রিভলভার। সেটাও টেনে নিল জুবায়ের।

চিৎকার-চেঁচামেচিকে ছাপিয়ে উঠল শিরিনের তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলা, 'দরজা খুলছি! মাসুদ ভাই, গুলি করবেন না!'

পজিশন ছেড়ে নড়বে না, জুবায়েরকে নির্দেশ দিয়ে ছুটে জাহাজের পিছন দিকে চলে এল রানা। প্যাসেজের বাঁক ঘুরতেই বাল্কহেডে হেলান দিয়ে থাকতে দেখল শিরিনকে, খুকখুক করে কাশছে, চোখ ডলছে দু'হাতে। ধোঁয়া ভর্তি হসপিটাল থেকে এলোমেলো পা ফেলে বেরিয়ে আসছে ইসরায়েলিরা, তাদেরকে এক লাইনে দাঁড় করাচ্ছে সাদাত ও সোলায়মান। ব্র্যাকেট থেকে ফায়ার এক্সটিংগুইশার টেনে নিয়ে শিরিনের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'ফ্লেয়ার নেভাও, কুইক!'

ইসরায়েলিদের লাইনের ওপর চোখ বোলাল রানা। 'এই, তুমি! এদিকে এসো!'

ইতস্তত করছে সুলেরি, কোণঠাসা ইঁদুরের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ছুটে এসে তার লম্বা চুল ধরল রানা, টেনে এনে ছুঁড়ে দিল ক্রু মেসে, ভেতরে ঢুকে পায়ের ধাক্কায় বন্ধ করে দিল দরজা। টেবিলে বসে রয়েছে রাহমানভ, রুমাল দিয়ে চোখ মুছে অ্যামোনিয়ার জ্বালা কমাবার চেষ্টা করছে।

ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল সুলেরি, তাকে ধরে একটা চেয়ারে বসাল রানা। তারপর অকস্মাৎ একটা লাথি মারল হাঁটুর নিচে। কেঁদে উঠে জায়গাটা চেপে ধরল সুলেরি।

পিছনে টেবিল, শটগানটা তাতে রেখে রাহমানভের দিকে তাকাল রানা। 'কি অবস্থা?'

মাথা ঝাঁকাল বসনিয়ান। 'জ্বালা কমছে।'

'এটাই তোমার প্রথম ও শেষ ভুল, রাহমানভ,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা। 'তোমার ভাগ্য ভাল এখনও বেঁচে আছ।' সুলেরির দিকে ফিরল ও। 'ইনফরমেশন। বিশ্বাস করো, কিভাবে আদায় করতে হয় আমি জানি।'

চোখে নগ্ন ঘৃণা, এক দলা থুথু ফেলল সুলেরি। রানার চেহারায় কোন ভাব নেই। সুলেরি টেরই পেল না ঘুসিটা কোত্থেকে এল। চেয়ার সহ মেঝেতে ছিটকে পড়ল সে।

রানা অপেক্ষা করছে। সুলেরি প্রায় অচেতন, নাক-মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

'কেমন লাগছে, সুলেরি?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রানা। ধীরে ধীরে বসল সুলেরি। 'এখনও শুরুই করিনি।' টেবিল থেকে নেমে স্টুয়ার্ডের সামনে চলে এল, এক পায়ে দাঁড়াল একটা হাতের ওপর। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল সুলেরি, অপর হাতে রানার পা চেপে ধরল।

ঝুঁকল রানা, দুম করে ঘুসি মারল সুলেরির কানের পাশে। কান থেকে রক্ত বেরুচ্ছে দেখে পিছিয়ে এল ও। আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল সুলেরি। 'কি জানতে চান?'

'তুমি মোসাড এজেন্ট, আমি জানি,' বলল রানা। 'তোমার সঙ্গে আর ক'জন আছে?'

পলকের জন্যে দৃষ্টি সরাল সুলেরি। 'আর ক'জন মানে?'

'তারমানে এখনও তোমার শিক্ষা হয়নি?'

কথা না বলে রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সুলেরি।

'ক্যাপটেনের কেবিনে তোমার আচরণ দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল,' বলল রানা। 'আমরা জাহাজ দখল করার আগেই তোমার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে, সুলেরি।'

'আমি একা,' রক্তাক্ত ঠোঁট নেড়ে বলল সুলেরি।

'ব্যাকআপ ছাড়া মোসাড এজেন্ট?' মাথা নাড়ল রানা। 'সত্যি কথা বলো, সুলেরি। কথা দিচ্ছি, সহযোগিতা করলে তোমাকে শুধু আটকে রাখা হবে। বাধ্য না হলে আমরা কাউকে খুন করতে চাই না।'

'সত্যি কথাই বলছি, আমি একা...' কথা শেষ করেনি, বিদ্যুৎ খেলে গেল সুলেরির শরীরে। বেদম মার খেয়েও কিভাবে এত শক্তি পেল কে জানে, অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় কোন বিরতি না দিয়ে উরুতে বাঁধা খাপ থেকে একটা ছুরি বের করল সে, এক লাফে সিধে হলো, ছুরিটা চালাল সোজা রানার তলপেট লক্ষ্য করে।

সরে যাবার সময় পায়নি রানা। রিফ্লেক্স অ্যাকশনই বলতে হবে, ডান পা-টা শূন্যে তুলে বাড়িয়ে দিতে পারল শুধু। তারপরও ছুরির ডগা নাগাল পেয়ে গেল

রানার ট্রাউজার দু'ফাঁক করে পৌঁছে গেল নাভির কাছে। সুলেরির পেটে রানার পা, ঠেকিয়ে রেখেছে তাকে। পায়ের চাপ অগ্রাহ্য করে আরও এক ইঞ্চি সামনে বাড়ার চেষ্টা করছে সে, তাহলেই ছুরিটা রানার নাভিতে ঢুকতে পারে। রানা পা ভাঁজ করতে পারছে না, করলে আরও কাছে সরে আসবে সুলেরি। দু'হাত দিয়ে তার মাথাটা ধরল ও, তারপর হ্যাঁচকা একটা মোচড় দিল। রানার উদ্দেশ্য ছিল ঘাড়টা ভেঙে ফেলা, সেটা বুঝতে পেরে শরীরের সমস্ত পেশী শিথিল করে দিল সুলেরি, তারপর রানা যেদিকে মোচড়টা দিতে চাইছে সেদিকেই কাত করল শরীরটা। মোচড়টা সম্পূর্ণ করতে পারল না রানা, ওর হাত থেকে ছুটে গেল সুলেরির মাথা, ছিটকে মেঝেতে পড়ল সে। টেবিল থেকে শটগান তুলে তার দিকে তাক করল ও। 'কেউ যদি মরতে চায়, কার কি করার আছে!' শ্রাগ করল রানা।

ক্যাপটেন বেন দাইয়ান, ফার্স্ট অফিসার তারেক আজাম, একজন গ্রিজার ও একজন ডেকহ্যান্ডকে জাহাজের পিছনে, পোর্ট রেইলে পিঠ দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে, প্রত্যেকের হাত ঘাড়ের পিছনে। তাদের দিকে অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়েছে সাদাত ও সোলায়মান। হাতে উজি, ওদের দু'জনের কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে রয়েছে রানা। এদিকে জোছনা ছাড়া অন্য কোন আলো নেই।

পোর্ট-সাইড প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এল নওশাদ, সামনে সুলেরি। সুলেরির মাথার পিছনে রিভলভার ধরে আছে সে।

আফটার রেইলের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'ওদিকে।'

মোসাড এজেন্ট পজিশনে দাঁড়াতে নওশাদের দিকে তাকাল রানা। সুলেরিকে রেইলিঙের কাছে রেখে পিছু হটল নওশাদ।

উজির সিলেক্টর ঠেলে অটোমেটিকে আনল রানা। 'এটা একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আগেও সাবধান করা হয়েছে, আবারও করছি। কেউ সহযোগিতা না করুক, হামলা করলে রেহাই পাবে না।'

উজি তুলে গুলি করল ও। এক পশলা গুলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল সুলেরির মাথা, চাঁদের আলোয় অস্পষ্টভাবে বোঝা গেল সেটা বিস্ফোরিত হয়েছে। মাথাবিহীন শরীরটা ধাক্কা খেলো রেইলে, ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল সাগরে।

ঝট করে ইসরায়েলিদের দিকে ঘুরল রানা, হাতের অস্ত্রও ঘুরে গেল তাদের দিকে। 'সিদ্ধান্ত তোমাদের। আমরা কেউ আক্রান্ত হলে তোমাদের সবারই এই পরিণতি হবে।'

সাত

ব্রিজের স্টারবোর্ড উইং-এ দাঁড়িয়ে কফির মগে চুমুক দিচ্ছে মোস্তফা, নাক বরাবর সামনে বহুদূর দিগন্ত থেকে আকাশে উঠছে সূর্য। এখন থেকে সতেরো ঘণ্টা পর গোল্ডামেয়ারের সঙ্গে চিনুক হেলিকপ্টারের রনদেভো।

হুইলহাউসে ফিরে এল সে। হেলমকে পাশ কাটানোর সময় অটো-পাইলটের

ওপর চোখ বোলাল। জাহাজ ট্রু কোর্স ধরে এগোচ্ছে, কাজেই সন্তুষ্ট হয়ে রাডার-এর সামনে এসে দাঁড়াল, মগে চুমুক দিয়ে স্ক্রীন পরীক্ষা করছে।

'মর্নিং, ক্যাপটেন।' হুইলহাউসে ঢুকল রানা।

মোস্তফার মনে হলো, কাল রাতের ঘটনায় রানার কোন প্রতিক্রিয়াই হয়নি। আমস্টারডামে প্রথম ওকে যেমন দেখেছিল, আজও ঠিক সেই রকমই আছে–শান্ত, কঠিন ও দক্ষ। ওর অন্তরসত্তা সম্পর্কে কৌতূহলী না হয়ে পারা যায় না। এই লোক কি বিপদ আর মৃত্যুকে সত্যি পায়ের ভৃত্য বলে মনে করে? মুখটা যেমন ভাবলেশহীন, মনটাও কি তাই? 'মর্নিং, রানা।'

'খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছ তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল মোস্তফা। 'জানশের আর আমি পালা করে ঘুমিয়েছি। জাহাজ এখন অটো-পাইলটে। এই ধরো ন'টার দিকে জাহাজের কোর্সে পরিবর্তন আনতে হবে।'

'কিভাবে?'

হাসি চাপল মোস্তফা। কেন নয়, রানা জানতে চাইছে কিভাবে। এটাও ওর স্বভাব, ছোট্ট প্রশ্ন করে সমস্যার গভীরে ঢোকার প্রবণতা। রাডার স্ক্রীনের দিকে আঙুল তুলল সে। 'ইমেজটা দেখতে পাচ্ছ?'

স্ক্রীনের নিচের কিনারায় সবুজ বিন্দুটার দিকে তাকাল রানা। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'আরেকটা জাহাজ,' বলল মোস্তফা। 'প্রায় পঁচিশ মাইল পিছনে। যখন কোর্স বদলের সময় হবে, প্রায় সেই সময়ই আমাদের পাশে চলে আসবে ওটা।' শিরদাঁড়া খাড়া করল সে। 'আমার ইচ্ছে জাহাজটা আমাদেরকে ওভারটেক করুক। তারপর, আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে একশো কি দুশো গজ সামনে এগোলে, আমরা নতুন কোর্স জিরো-ফাইভ-সিক্স ডিগ্রী ধরে রওনা হব।'

রানা অপেক্ষা করছে।

'কেন এই কাজ করতে চাইছি সেটার ব্যাখ্যা হলো–সময়ের ওই পর্যায়ে দুই জাহাজের দুটো "ব্লিপ" শোর রাডারে মিলিত হয়ে একটা হয়ে যাবে। তারপর যখন আবার আলাদা হবে, রাডার অপারেটররা ধরে নেবে জিরো-এইট-নাইন ডিগ্রী ধরে যে জাহাজ এগোচ্ছে সেটা গোল্ডামেয়ার।' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল মোস্তফা। 'বুঝতে পারছ?'

'নির্দিষ্ট ওই জাহাজটাকে বেছে নেয়ার কি কারণ?'

'কারণ রাডার স্ক্রীনে আমাদের ইমেজ একই আকৃতির দেখা যাবে। এই কাজে আমরা শুধু সুপারট্যাংকার বা ছোট আকারের জাহাজ ব্যবহার করতে পারব না। রাডার স্ক্রীনে ওগুলো হয় বড় নয়তো ছোট দেখাবে।'

'ভালই,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'যদি ধরে নিই পিছনের জাহাজটাও কোর্স বদল করবে না।'

দুই হাত দু'দিকে মেলে দিল মোস্তফা। 'এখানেই নিয়তির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এতে যদি কাজ হয়, প্রয়োজনীয় সময়টা পেয়ে যাব আমরা।'

ব্রিজ উইন্ডোর সামনে এসে দাঁড়াল রানা। নিচে, ফোরডেকে, তারপুলিন দিয়ে

ঢাকা মিসাইলটা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ক্যাপটেন বেন দাইয়ানের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ভদ্রলোকের স্ত্রী কেমন আছেন খবর নেয়া দরকার।

ব্রিজ থেকে নেমে এল রানা। প্যাসেজে সোলায়মান পাহারা দিচ্ছে। 'ভদ্রলোক কোন অভিযোগ করছেন?'

সোলায়মান মাথা নাড়ল। 'স্ত্রীকে নিয়ে অস্থির হয়ে আছেন। মহিলার অবস্থা সত্যি খুব খারাপ।'

'ভেতরে আমাদের কেউ আছে?' জবাবে সোলায়মান আবার মাথা নাড়ল। 'শিরিনকে খবর পাঠাও, মহিলার দেখাশোনা করুক।' কেবিনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা।

বাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দাইয়ান, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন স্ত্রীর মুখের দিকে। মহিলা একদম স্থির, শ্বাস-প্রশ্বাস এত ক্ষীণ যে গায়ের চাদর নড়ছে না। ইসরায়েলি ক্যাপটেনের দিকে না তাকিয়ে রেডিও অপারেটরের কপালে একটা হাত রাখল রানা। ঘামে ভেজা, অত্যন্ত গরম।

চোখে আক্রোশ, রানার দিকে তাকিয়ে আছেন দাইয়ান।

'ক্ষতগুলো আমি একবার দেখতে চাই,' বলে অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল রানা। মহিলার কলারবোনের নিচের ক্ষতটা মারাত্মক নয়। ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়ায় রক্ত পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। ওয়েস্ট লাইনের কাছে লাগা বুলেট বেরিয়ে গেলেও, ওখান থেকে বেশ অনেকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। ব্যান্ডেজ বাঁধা হলেও, রক্ত পড়া এখনও বন্ধ হয়নি। 'আপনার এত উদ্বিগ্ন হবার কিছু দেখি না,' দাইয়ানকে বলল ও। 'প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে, এখনও হচ্ছে, সেজন্যেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন উনি। আপনার সাহায্য পেলে ওনাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারি আমরা।'

দাইয়ান কথা বলছেন না।

'আপনার স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ কি বলবেন, প্লীজ?'

বিড়বিড় করলেন দাইয়ান, এই সময় কেবিনে ঢুকল শিরিন। তার দিকে ফিরে রানা বলল, 'আরেকবার হসপিটালে ঢুকতে হবে তোমাকে, শিরিন। ব্লাড ট্র্যান্সফিউশন-এর সরঞ্জাম আছে কিনা খুঁজে দেখো। ক্যাপটেনের স্ত্রীকে রক্ত দিতে হবে। সোলায়মান আর জুবায়েরকে নিয়ে যাও।'

'কে রক্ত দেবে, মাসুদ ভাই?' বিস্ময় চেপে রেখে জানতে চাইল শিরিন।

'ওঁর রক্তের গ্রুপ আমার সঙ্গে মেলে, কাজেই...তাড়াতাড়ি যাও!'

'জ্বী!' বলে ছুটে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল শিরিন।

মুখ ঘুরিয়ে আরেক দিকে তাকিয়ে আছেন দাইয়ান।

কানে হেডসেট লাগিয়ে রেডিও রুমে বসে রয়েছে নওশাদ, রানা ভেতরে ঢুকতে চোখ তুলে তাকাল। 'স্বাভাবিক ট্র্যাফিক, ওয়েদার ফোরকাস্ট, এইসব।'

দরজার চৌকাঠে হেলান দিল রানা। 'ন'টার দিকে কোর্স বদলাচ্ছি আমরা। তারপর থেকে সারাক্ষণ প্রতিটি ফ্রিকোয়েন্সি চেক করবে। কেউ যদি কিছু সন্দেহ করে, আমি যেন প্রথমে জানতে পারি।'

ঘুরতে যাবে রানা, নওশাদ বলল, 'তোমাকে কেমন যেন ম্লান দেখাচ্ছে—নাকি আমার চোখের ভুল, রানা?'

উত্তরটা এড়িয়ে গেল রানা। 'তোমাকেও খুব একটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না,' বলে হাসল।

'দাইয়ানের স্ত্রী কেমন আছেন?' মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করল নওশাদ। 'বাঁচবেন?'

চেহারা কঠিন ও গম্ভীর হয়ে উঠল রানার। 'এ অত্যন্ত শক্ত প্রশ্ন, নওশাদ। ইসরায়েলিরা যদি বাঁচে, আমরা মারা যাব। আমরা যদি বাঁচি, ওরা মারা যাবে। তবে ব্যক্তিবিশেষের কপালে কি আছে সেটা আমরা কেউ জানি না।'

শূন্য দরজায় তাকিয়ে থাকল নওশাদ। হাসানের খোঁজে তার কেবিনে চলে এল রানা। হাসান ঘুমাচ্ছে। ঘুম ভাঙাতে জানতে চাইল, 'ক'টা বাজে, মাসুদ ভাই?'

'ছ'টা বিশ। তোমার কাজ শেষ?'

'চার্জগুলো জায়গামত বসানো হয়েছে। এক নম্বর হোল্ড আর চেইন লকারের মাঝখানে ইন্সপেকশন প্লেটগুলো সরাইতেই বেশিরভাগ সময় বেরিয়ে গেছে।'

'শেষ করতে আর কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'এই ধরুন পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

'ঠিক আছে, সে-সময় তুমি পাবে। কোন সমস্যা?'

একটু ইতস্তত করে হাসান বলল, 'না…নাহ্।'

'মানে?'

ঘাড় চুলকাচ্ছে হাসান। 'সিরিয়াস কিছু না আর কি। কাজ সেরে কেবিনে ফিরছিলাম, সাদাতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। খুব কৌতূহলী মনে হলো ওকে। জানতে চাইল কোথায় ছিলাম আমি। ক্রুদের সঙ্গে রীতিমত ছোটখাট যুদ্ধ হয়ে গেল, অথচ আমাকে দেখা যায়নি কেন।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তুমি কি বললে?'

'বললাম, হোল্ডগুলো সার্চ করছিলাম, লিবীয়ানরা কিনতে পারে এমন কিছু পাবার আশায়।'

'বিশ্বাস করল?'

'দেখে তো তাই মনে হলো, তারপর জানি না।'

ন'টা তিন মিনিটে দেখা গেল দশ হাজার টনী নরওয়েজিয়ান বাল্ক ক্যারিয়ার বুরল্যানডাবারজেন পোর্ট সাইডের এক কেইবল্ দূরে, গোল্ডামেয়ারের পাশে চলে আসছে। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, ওটার স্টার্নে সতর্ক দৃষ্টি রাখল মোস্তফা। দুটো জাহাজের দূরত্ব যখন সঠিক মনে হলো, ঘাড় ফিরিয়ে নির্দেশ দিল জানশেরকে, 'স্টিয়ার জিরো-ফাইভ-সিক্স ডিগ্রীজ ট্রু, জানশের।'

পোর্টের দিকে হেলম ঘোরাল জানশের, দৃষ্টি কম্পাস কাঁটার ওপর স্থির। ধীরে ধীরে ঘুরে গেল বো, বাল্ক ক্যারিয়ারের ফেলে যাওয়া পথটাকে আড়াআড়িভাবে পার হয়ে নতুন কোর্স ধরে ছুটল গোল্ডামেয়ার।

রাডার সেটের সামনে চলে এল মোস্তফা, সমস্ত মনোযোগ স্ক্রীনের ওপর, অপেক্ষা করছে। ত্রিশ সেকেন্ড পর দেখতে পেল সে। সবুজ একটা 'ব্লিপ', স্ক্রীনের মাঝখান থেকে সামান্য ডানে। ওটার দিকে একটা আঙুল তাক করে বলল, 'শোর রাডারে এটাই আমরা।'

'তোমার হিসারে ভুল না থাকলেই বাঁচি, ক্যাপটেন,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে বাল্ক ক্যারিয়ারের দিকে। 'যাও, বাপ, যেতে থাকো—কোর্স বদলে আমাদেরকে ফাঁসিয়ে দিয়ো না।'

ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াৎ ফারাজি চোখ মেললেন, মনে পড়ে যাওয়ায় এক পাশে ঝুঁকে ডান পায়ের কাছে ফেলে রাখা ব্রিফকেসটা ছুঁলেন একবার, তারপর সিধে হয়ে বসে হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলালেন। ওমান এয়ারলাইন্সের সেভেন-জিরো-সেভেন টেক অফ করার পর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, বেশিরভাগ আরোহীই ঘুমিয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে।

'কফি, স্যার?'

'ব্ল্যাক। নো সুগার।'

সামনের ফোল্ডিং টেবিলটার ভাঁজ খুললেন ফারাজি। স্টুয়ার্ড কফি পরিবেশন করছে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। সোমালিয়ার মোগাদিসুতে যাচ্ছেন তিনি, ওখানে একটা কাজ সেরে ফিরে যাবেন ত্রিপোলি। স্পেশালাইজড গাইডেন্স সিস্টেম সহ নতুন আমেরিকান মিসাইল ইসরায়েলিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার সমস্ত আয়োজন সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন, মনটা সেজন্যে তৃপ্তিতে ভরে আছে। এডেনে অপারেশনের শুরুটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নিজস্ব উৎস থেকে রিপোর্ট পেয়েছেন, মাসুদ রানা তার দল নিয়ে গোল্ডামেয়ারে উঠতে পেরেছে, টাইমটেবল ধরে সোকোট্রা ন্যাভাল বেসের উদ্দেশে রওনাও হয়েছে সেটা। এলাকায় ইসরায়েলি রেডিও মনিটরিং সিস্টেমে এখনও সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়েনি, সে-খবরও পেয়েছেন তিনি। কাজেই ধরে নেয়া চলে অপারেশনটা সফল না হবার কোন কারণ নেই। তিনি সন্তুষ্ট।

মিসাইলটা লিবীয়ার দরকার, যে-কোনভাবেই হোক একটা যোগাড় করতে হবে—এটাই ছিল তাঁর ওপর সরকারী নির্দেশ। এই নির্দেশে একটাই মাত্র শর্ত ছিল—মিসাইলটা কে বা কারা ছিনিয়ে নিল তা যেন কোনদিনই ইসরায়েল বা অন্য কেউ জানতে না পারে। সেই শর্ত মেনে নিয়েই কাজটায় তিনি হাত দেন। যে-কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয় তাঁকে, এমন কি পরে জবাবদিহি করতে হবে না বলেও নিশ্চয়তা দেয়া হয়। কাজেই প্ল্যানটা নিজেই তৈরি করেন, কারও সঙ্গে পরামর্শ করেননি বা কারও অনুমতিও চাননি।

তাঁর প্ল্যান সফল হলে লিবীয়া মিসাইলটা হাতে পাবে, অথচ কার প্রস্তাবে কে চুরি করল তা কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। নিউক্লিয়ার সাবমেরিন খুশান তোফার কমান্ডারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া আছে। মিসাইলটাই গ্রহণ করবেন তিনি। শুধু মিসাইলটাই।

অপরাধবোধ? নাহ্! এই পেশায় মাঝে মধ্যে বন্ধুকেও হাসিমুখে জবাই করতে হয়, নির্মম হলেও এটাই তো বাস্তব সত্য।

এ, এইচ, এম, মুহিত
বই লাভার্স পোলাপান

আট

উত্তপ্ত এঞ্জিন রুমের স্থির বাতাসে তেলের গন্ধ। মাঝখানে প্রকাণ্ড সালজার অচল হয়ে পড়ে আছে, কোন শব্দ করছে না। ওপরের ক্যাটওয়াকে রয়েছে রানা, হ্যান্ডরেইলের ওপর ঝুঁকে ইনজেকশন সিস্টেম মেরামতের কাজে গলদঘর্ম হতে দেখছে বাখারা আর জামালুকে। দ্বিতীয়বার গোলযোগ দেখা দিয়েছে এঞ্জিনে, তবে এবারকার সমস্যা গুরুতর। স্রোতের টানে দু'ঘণ্টা হলো ভেসে চলেছে জাহাজ। মেরামতের কাজ এখনও শেষ হয়নি। এই সমস্যা ওদের জন্যে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। কোর্স থেকে সরে এসেছে জাহাজ, কোনভাবেই এখন আর নির্দিষ্ট সময়ে রনদেভোয় পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

গ্রিজে ভেজা ডেক প্লেটে পা পিছলে গেল, ধাতব কিছুতে বাড়ি খেলো হাঁটু, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল জামালু। টেলিগ্রাফের ওপর বাল্কহেডের ঘড়িতে সময় এখন সতেরো ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট। মরচে ধরা এই বালতি কিছুক্ষণের মধ্যে সচল না হলে ওদের এই মিশন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

দড়াম করে খুলে গেল এঞ্জিন রুমের দরজা। ফাঁকটার ফ্রেমে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে হাসান। 'বিপদ!' গলায় চাপা উত্তেজনা।

'কি বিপদ?'

'ইসরায়েলি পেট্রল বোট।'

'ওহ্ গড! কোথায়? কি করছে?'

'আমাদেরকে একবার চক্কর দিয়ে স্থির হয়ে আছে। এই মাত্র একটা সিগন্যাল পেয়েছি।'

রানার মাথায় ঝড়। বাখারার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, 'আর কতক্ষণ?'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সিধে হলো বাখারা। কোমর ডলতে ডলতে মুখ তুলে তাকাল। 'প্রায় শেষ। আর দশ মিনিট।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমি না বলা পর্যন্ত এঞ্জিন স্টার্ট দেবে না।'

হাসানকে নিয়ে ছুটল রানা, ব্রিজের দিকে যাচ্ছে। ক্রস-প্যাসেজওয়েতে দেখা হলো সাদাত আর তার লোকজনের সঙ্গে। এই প্যাসেজ ডেকে গিয়ে মিশেছে। এক জায়গায় জড়ো হয়ে অপেক্ষা করছে তারা।

'ওদিকে।' স্টারবোর্ডের দিকে হাত তুলল হাসান। অস্তগামী সূর্য লাল একটা মস্ত থালা, তার গায়ে হাঙর আকৃতির ইসরায়েলি টর্পেডো বোট—সরু ব্যারেলের এক জোড়া কামান গোল্ডামেয়ারের আগা ও ডগার দিকে তাক করা। একটা ল্যাম্প টর্পেডো বোটের মাঝখান থেকে ঘন ঘন জ্বলে-নিভে সঙ্কেত দিচ্ছে।

'সাদাত!' হাতছানি দিয়ে ডাকল রানা। 'গোল্ডামেয়ারের ক্রুরা নিজেদের চেহারা দেখালে বা কোন শব্দ করলে সব শেষ, কেউ আমরা বাঁচব না।' মাথা ঝাঁকিয়ে ফিরে গেল সাদাত। হাসানের দিকে ফিরল ও। 'আমাদের সমস্ত ফায়ারপাওয়ার রেডি চাই আমি। আর ডেকে লোক রাখো। কাউকে দেখতে না

পেলে সন্দেহ করবে ওরা। আমার অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলবে না।'

ইন্টারনাল কম্প্যানিয়নওয়ে ল্যাডার ধরে ব্রিজে উঠছে রানা, জুবায়েরকে পাশ কাটাচ্ছে। সেলুনের বাইরে পাহারা দিচ্ছে সে, ওখানে গোল্ডামেয়ারের অফিসারদের আটকে রাখা হয়েছে। 'ওরা দেখেছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বোটটা এত তাড়াতাড়ি এল, বাধা দেয়ার সময় পাইনি,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জুবায়ের। 'তবে এখন ওরা দেখতে পাচ্ছে না।'

সেলুনে উঁকি মেরে রানা দেখল মেঝেতে চারজন ইসরায়েলি অফিসার উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে, প্রত্যেকের হাত ঘাড়ের পিছনে। 'এভাবেই যেন থাকে।'

পোর্ট এন্ট্রান্সওয়ে ধরে হুইলহাউসে ঢুকছে রানা, ব্রিজের স্টারবোর্ড উইং-এ চোখ চলে গেল। ওখানে একটা সিগন্যাল ল্যাম্প অপারেট করছে মোস্তফা।

ফোনটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে নওশাদকে ডাকল রানা। 'কিছু পাচ্ছ?'

'না। পাবার কথা?'

'কাছেই একটা ইসরায়েলি টর্পেডো বোট পাঁয়তারা কষছে। এই মুহূর্তে সিগন্যাল ল্যাম্প নিয়ে ব্যস্ত।'

'মাইরি বলছি, খেলা এবার জমবে।' নওশাদ তিলমাত্র বিচলিত নয়।

গম্ভীর হলো রানা। মার্সেনারিদের মধ্যে এই একটা লোকই আছে যে মাঝে মধ্যে ওকে বিস্ময়ের ধাক্কা দিতে পারে। 'ওরা রেডিও ব্যবহার করলে আমি যেন সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারি।'

এরপর এঞ্জিন রুমকে ডাকল রানা। জামালু সাড়া দিল। 'তোমার কাজ শেষ, জামালু?'

'হ্যাঁ। এইমাত্র শেষ হলো। তবে এঞ্জিন টেস্ট করতে হবে।'

'তার সময় হয়তো পাবে না। জাস্ট স্ট্যান্ডবাই ফর অর্ডারস।'

ফোন নামিয়ে রাখছে রানা, উদ্বিগ্ন মোস্তফা হুইলহাউসে ঢুকল। 'সমস্যা, ভাই! ওরা আমাদের উপকারী বন্ধু হতে চাইছে।'

'ব্যাখ্যা করো।'

'এটা ওদের নিয়মিত পেট্রল এরিয়া। আমাদেরকে দেখতে পেয়ে থেমেছে, স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাইছে আমরা কোর্স ছেড়ে এখানে কেন, স্থির হয়ে থাকারই বা কি কারণ।'

'উত্তরে কি বলেছ তুমি?'

'বলেছি, সেই এডেন থেকে ঝামেলা করছে এঞ্জিন, তাই আমি সিদ্ধান্ত নিই সেহাট-এ যাব। ওটা ইয়েমেনি কোস্ট-এর আরও সামনের একটা বন্দর। এর চেয়ে ভাল উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় খেলেনি। আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য সোকোট্রা দ্বীপ, এটা বলা নিশ্চয়ই বোকামি হত, তাই না?'

চার্টরুম থেকে বেরিয়ে এল জানশের, হাতে একটা চার্ট। সেটার ভাঁজ খুলল। 'হিসাব করে দেখলাম আমাদের বর্তমান পজিশন এখানে।' একজোড়া ডিভাইডার দিয়ে চিহ্নিত করল সে। 'লোকাল কারেন্ট আর অ্যারাবিয়ান সাগরের বাতাস কোর্স থেকে ঠেলে দশ মাইল দূরে সরিয়ে এনেছে।'

'তাছাড়া,' বলল মোস্তফা, 'এটাই আমাদের একমাত্র সমস্যা নয়। এঞ্জিন যদি

রওনা হবার জন্যে তৈরিও থাকে, ওই পেট্রল বোটকে খসানো সম্ভব নয়। এঞ্জিন মেরামত সম্ভব হলেও ওরা আমাদেরকে এসকর্ট করে বন্দরে পৌঁছে দিতে চাইছে, পরে সমস্যা হলে যাতে সাহায্য করতে পারে।'

দু'জনেই ওরা রানার দিকে তাকিয়ে কি সিদ্ধান্ত হয় জানার অপেক্ষায় আছে। কয়েক মুহূর্ত নড়ল না রানা। তারপর হুইলহাউসের স্টারবোর্ড সাইডে হেঁটে এসে চকচকে যুদ্ধজাহাজটার দিকে তাকাল। 'এ-ধরনের বোটে সাধারণত ক'জন ক্রু থাকে?' জানে, তবু নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে।

মাথা চুলকাল মোস্তফা। 'সম্ভবত তিনজন অফিসার। অবশ্যই একজন পেটি অফিসার।'

'এঞ্জিনে সম্ভবত চারজন আছে,' বলল জানশের। 'ওটার আকার আর আর্মামেন্ট দেখে বলা যায়–এই ধরো, আরও বারোজন।'

'তারমানে কম করেও বিশজন,' বিড়বিড় করল রানা। দরজার কাছ থেকে ঘুরে রাডার সেটের সামনে চলে এল। ওদের আশপাশে ট্র্যাফিক খুব কমই দেখা যাচ্ছে। সিধে হচ্ছে, দেখল বড় আকারের একটা মেটাল টুল বক্স নিয়ে ফো'ক্যাসল থেকে বেরিয়ে আসছে হাসান।

'কি করতে চাও, ভাই?' মোস্তফা জিজ্ঞেস করল।

'ইসরায়েলিদের টর্পেডো বোটে উঠতে চাই,' বলল রানা। 'আমার ইচ্ছা নয় আমাদের কোন প্রতিবেশী থাকুক।'

প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করছে রানা, মনোযোগ দিয়ে শুনল হাসান। রানা থামতে দ্বিমত প্রকাশ করতে দ্বিধা করল না। 'প্ল্যানটায় অনেক ফুটো, মাসুদ ভাই। অনেক কিছুই প্রত্যাশা অনুসারে না-ও ঘটতে পারে। ছোট্ট একটা ভুল করার অর্থ হবে বাঘের লেজ ধরে টান দেয়া। এই বাঘ রয়েল বেঙ্গলের চেয়েও ভয়ঙ্কর।'

'এরচেয়ে ভাল কোন প্ল্যান থাকলে দাও,' বলে পোর্টহোলের সামনে চলে এল রানা। সন্ধ্যা লেগে আসায় টর্পেডো বোটটাকে আবছা দেখাচ্ছে–হিংস্র নেকড়ের মত।

হাসান চুপ করে আছে।

'আর কোন উপায় নেই,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'লোকজনকে জড়ো করো। আমি ব্রিজে যাচ্ছি।'

গোল্ডামেয়ার ঢেউয়ের তালে তালে দোল খাচ্ছে, পেশী শক্ত করে নিজেকে আলিঙ্গন করল মোস্তফা। হুইলহাউস উইন্ডোর নিচের শেলফ থেকে একটা পেন্সিল খসে পড়ে গড়াতে শুরু করল। 'আমি তোমার সঙ্গে একমত,' বলল সে। 'আর কোন উপায় নেই।'

'সিগন্যাল দাও ওদের,' বলল রানা। 'বলো, ওরা যদি আধ ঘণ্টার জন্যে এঞ্জিনিয়ারিং অফিসারকে ধার হিসেবে দেয়, আমরা কৃতজ্ঞবোধ করব।'

'যদি জিজ্ঞেস করে–কেন?'

'বলবে আমাদের এঞ্জিনিয়ার চেষ্টার ত্রুটি করছে না, কিন্তু একার বুদ্ধিতে সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না। তার অদক্ষতার কারণে এখানে আমরা অচল হয়ে পড়ে

থাকতে পারি না।'

সিগন্যাল ল্যাম্প তুলে নিয়ে স্টারবোর্ড উইং-এ বেরিয়ে গেল মোস্তফা। শাটার ক্লিক শুরু করতে রাডার স্ক্রীনে তাকাল রানা। টর্পেডো বোট ছাড়া কাছাকাছি আর মাত্র একটা বোট রয়েছে, তা-ও দশ মাইল দূরে, যাচ্ছেও ওদের উল্টোদিকে।

হুইলহাউসে ফিরে এল মোস্তফা। 'ওরা আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। ওদের বলেছি, স্টারবোর্ডের দিক থেকে একটা মই নামাচ্ছি—ওটা তিন নম্বর হোল্ডের পাশে।'

সামনে রানা দেখল টর্পেডো বোটের নেভিগেশন লাইট এগিয়ে আসছে। 'যাই, রিশেপসন কমিটিতে যোগ দিই।'

হাসান ও নওশাদ স্টারবোর্ড বুলওঅর্কের পাশে, দু'জন মিলে গুটানো একটা মই ধরে আছে, ধাপগুলো কাঠের। হাসানের ডান দিকে সাদাত ও জুবায়ের গুড়ি মেরে বসে রয়েছে, দৃষ্টিপথের বাইরে। একই ভঙ্গিতে, নওশাদের বাম দিকে রয়েছে রানা, জানশের, শিরিন ও রাহযানভ।

'বোটটা ঘুরছে,' ফিসফিস করল হাসান। 'পাশে চলে আসার পর ওটার মুখ থাকবে আমাদের পিছন দিকে।'

পেট্রল বোট এগিয়ে আসছে, ওটার লেআউটে চোখ বুলাচ্ছে রানা। গান টারিট ছাড়া ফোরডেক খোলা ও পরিষ্কার। ফোরডেকের সরাসরি পিছনে ব্রিজ—নিচু, চ্যাপ্টা আকৃতির একটা কাঠামো, পিছন দিকটা দখল করে রেখেছে রেডিও আর রাডার অ্যান্টেনা। বাকি সব কল্পনায় ধরা দিল। ব্রিজের নিচেই আশা করা যায় কমিউনিকেশন রূম—ওর টার্গেট। সরাসরি ওটার পিছনে এঞ্জিন রূম হ্যাচ, দ্বিতীয় গান টারিট, সঙ্গে নিচু ও লম্বা ফ্যানটেইল, র‍্যাকে সাজানো ডেপথ চার্জ সহ। সব শেষে দুটো টর্পেডো টিউব, ব্রিজের দু'দিকে। তাড়া আছে এমন লোকের জন্যে নড়াচড়ার জায়গা খুব কম।

চোখের কোণে কিছু ধরা পড়ল। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ফোরডেকে নেমে আসছে মোস্তফা। যার ব্রিজে থাকার কথা, সে এখানে কি করছে? নওশাদের পাশে থামল সে, সরাসরি টর্পেডো বোটের দিকে তাকিয়ে আছে।

'এখানে কি করছ তুমি?' চাপা গলায় প্রায় গর্জে উঠল রানা।

বাঁ হাত নেড়ে দুর্বোধ্য একটা ইঙ্গিত করল মোস্তফা। 'আরে ভাই, এরকম একটা লড়াই থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলে নিজেকে তোমার কাপুরুষ মনে হবে না?'

রানা কিছু বলার আগেই একটা চিৎকার ভেসে এল। হাসান ও নওশাদ মইটা জাহাজের নিচে নামাচ্ছে, পাল্টা গলা চড়িয়ে হিব্রু ভাষায় জবাব দিল মোস্তফা। এরপর টর্পেডো বোটের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। গোল্ডামেয়ারের গায়ে ওটার ফেন্ডার ঘষা খেতে সামান্য ঝাঁকি খেলো সবাই।

গলায় পরিচিত শুকনো ভাব, ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজের পুরোটা দৈর্ঘ্যের ওপর তীক্ষ্ণ চোখ বোলাচ্ছে রানা। দু'জন রেটিং ফেন্ডার ধরে আছে—একজন স্টারবোর্ড টর্পেডো টিউবের সামনে, অপরজন ওটার পিছনে। ডেকে আরও তিনজনকে দেখা

যাচ্ছে—দু'জন সামনের গান টারিটের পাশে, অপরজন পট ড্রাম রাডার মাস্ট-এর পাশে। খোলা ব্রিজে, ওয়েদার ডজার-এর গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে—রানার ঠিক উল্টোদিকে—তিনজন অফিসার। মইটা জাহাজের গায়ে বাড়ি খেয়ে শব্দ তুলল, শুনতে পেয়ে নিচে তাকাল ও।

অল্প কয়েকটা ধাপ, সেগুলো বেয়ে এক লোক ওর দিকে উঠে আসছে, ইউনিফর্মের কাঁধে ব্যাজ দেখে বোঝা গেল একজন অফিসার। তার মাথা বুলওঅর্ক বরাবর উঁচু হতে নাগাল পাবার জন্যে ঝুঁকল হাসান ও নওশাদ। ওদের দু'জোড়া হাত এঞ্জিনিয়ারের একজোড়া হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। শূন্যে উঠল লোকটা। তাকে ছেড়ে দিল ওরা। উড়ে গিয়ে তাদের পিছনে মিসাইল ক্রেইটে মাথা দিয়ে পড়ল সে। অকস্মাৎ মোস্তফার হাতে বেরিয়ে এল একটা উজি, পায়ের কাছে সদ্য পড়া নিথর শরীরে পরপর দুটো গুলি করল।

লাফ দিল রানা, টর্পেডোর টিউবের পিছনে দাঁড়ানো রেটিঙের বুকে দু'পা দিয়ে নামল। ছিটকে স্টীল বাল্কহেডে ধাক্কা খেলো রেটিং। ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে, ভারসাম্য ফিরে পেয়ে পিছনের পায়ে ভর দিল রানা, তারপর শরীরের সমস্ত ওজন সহ তার গলায় সেঁধিয়ে দিল শটগানটা।

হাসান উদয় হলো শিরদাঁড়া খাড়া করে, এ/কে ফরটিসেভেন থেকে পেট্রল বোটের ব্রিজে দাঁড়ানো অফিসারদের লক্ষ্য করে বিরতিহীন গুলি করছে। চিৎকার, গোঙানি, ছুটোছুটি, পতনের আওয়াজ, শক্ত মেটালে লেগে আরেকদিকে ছুটে যাওয়া বুলেটের শিস, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত—সবগুলো একসঙ্গে দৃষ্টি কাড়তে চায়। রানার নেতৃত্বে মার্সেনারিদের অ্যাকশনে কোন রকম ছন্দপতন ঘটল না, একযোগে লাফ দিয়ে টর্পেডো বোটের ডেকে নামল তারা।

ফরওয়ার্ড ফেন্ডার ধরে থাকা লোকটা কোন সুযোগই পেল না। জুবায়েরের হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল—রোদ নেই কাজেই কোন ঝিলিকও নেই—লোকটা বুঝতেই পারল না তার গলায় হাতলের কিনারা পর্যন্ত একটা ছুরি ঢুকেছে।

একটা গড়ান দিয়ে সিধে হলো হাসান, ফরওয়ার্ড গান টারিটে উপস্থিত লোক দু'জনকে গুলি করল নিতম্বের কাছ থেকে।

হাসান এক নম্বর হোল্ড থেকে গ্রেনেড এনেছে, লোয়ার ব্রিজ ডোর-এর কবাট খুলে ভেতরে গড়িয়ে দিল তারই একটা। ওটা বিস্ফোরিত হতেই ডেকে হাঁটু গেড়ে শক্ত করল শরীরটা, দরজার ভেতর গুলি করল এক পশলা। দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ফেলল ডেকের নিচে ক্রু কোয়ার্টারে। তারপর এগোল ব্রিজের দিকে।

নওশাদ, জানশের, শিরিন ও রাহমানভ রানাকে পাশ কাটিয়ে বোটের পিছন দিকে চলে গেল। ব্রিজের পিছনে লোয়ার সুপারস্ট্রাকচারের সমতল মাথায় উঠে এল রানা। কয়েক ফুট দূরে একটা আর্মারড ডোর, ওটার সরাসরি নিচে রেডিও মাস্ট। বিচার-বিশ্লেষণের সময় নেই, পা চালিয়ে ডেক পার হলো, হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল দরজাটা। গুলি শুরু করার পর দেখতে পেল লোকটাকে, তার সামনে কয়েক স্তরে সাজানো রেডিও ইকুপমেন্ট, মাইক্রোফোনটা মুখের সামনে তুলছে। শটগানের একটা গুলি তার পাঁজরে লাগল, চেয়ার সহ ছিটকে পড়ল বাল্কহেডের গায়ে। এক পা পিছিয়ে শটগান তাক করল রানা রেডিও ইকুইপমেন্টের দিকে।

কিন্তু ট্রিগার টানার আগে ওপর থেকে ওর গায়ে পড়ল এক লোক।

ডেকটা যেন উঠে এল রানার দিকে, আছাড় খাবার পর মনে হলো হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে, হাত থেকে খসে গেছে শটগানটা। মাথায় কিছু একটা আঘাত করল, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চোখের সামনে ঘুরতে শুরু করল দুনিয়াটা। এখন শুধু আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি যদি কিছু করতে পারে। শরীরের নিচে থেকে ডান হাতটা বের করে ওপর দিকে চালাল সবেগে, আঙুলগুলো ইস্পাতের হুক হয়ে গেছে। কাপড় আর মাংসে ঢুকল ওগুলো, ঢুকতেই টান দিল নিচের দিকে। পাঁজরে প্রচণ্ড ঘুসি খেলো রানা, ব্যথাটা গোটা বুকে ছড়িয়ে পড়ল, শরীরটা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মোচড় খাচ্ছে, তবে লাভ হলো এই যে বাম হাতটাও এবার মুক্ত হলো–শুধু তাই নয়, কনুইয়ের একটা গুঁতো ঠেকিয়েও দিল ওটা। মরিয়া হয়ে লোকটাকে নিজের দিকে টেনে আনছে রানা, আঘাতগুলো তাতে হালকা হবে। ওর মুখে নরম মাংস ঘষা খেলো, সুযোগ পেতেই একটা কান কামড়ে ধরল ও। ব্যথায় চিৎকার দিল শত্রু।

এঞ্জিন রূমের স্কাইলাইট খুলতেই কেউ একজন হাসানের গোড়ালি ধরে টান দিল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পড়ে গেল সে, সরু ফাঁকটার অর্ধেক বাইরে অর্ধেক ভেতরে। নিচে থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, বুলেটটা তার বেল্ট বাকলকে একটুর জন্যে না ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। হাসানের পিছনে আঁতকে ওঠার শব্দ করে কাত হলো জুবায়ের। রাহমানভের উজি হাসানকে ছাড়িয়ে গেল, এঞ্জিনরূমে গুলি করল পুরো এক ম্যাগাজিন। হাসানের গোড়ালি মুক্ত হলো, টেনে তাকে সরু ফাঁকটা থেকে সরিয়ে আনল জানশের, পরমুহূর্তে এঞ্জিন রূমে একটা গ্রেনেড ফেলল শিরিন, ফেলেই টেনে বন্ধ করে দিল স্কাইলাইট।

রানার কাঁধ ডেকে সেঁটে আছে, বিস্ফোরণের ধাক্কায় ডাঙায় তোলা মাছের মত আছাড় খেলো। দু'সারি দাঁত পরস্পরের নাগাল পেতে মুখটা ভরে উঠল রক্তে। আবার চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, অকস্মাৎ খিঁচুনি ওঠার ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেয়ে মুক্ত করল নিজেকে। মুখ থেকে কানের লতি ফেলে কোন রকমে এক হাঁটুর ওপর সিধে হলো রানা। ওর সামনে ঝাপসা একটা আকৃতি, যেন একটা টাওয়ার। ওপর দিকে লাফ দিল ও, ঠেলে লোকটাকে পিছু হটতে বাধ্য করবে। কিন্তু সংযোগ ঘটাতে পারার আগেই একটা বুট ডেবে গেল ওর পেটে, শূন্যে একটা ডিগবাজি খেলো শরীরটা, ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল, ধপাস করে পড়ে গেল মেইন ডেকে।

প্রকাণ্ডদেহী ইসরায়েলি পেটি অফিসার, কান থেকে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে, ঝুঁকে শটগানটা তুলে নিয়ে সিধে হলো, মাজলটা ঘোরাচ্ছে রানার দিকে।

দুটো আগ্নেয়াস্ত্র একসঙ্গে বিস্ফোরিত হলো। অটোমেটিকে সিলেক্টর, কোমরের কাছে ধরা উজির ট্রিগার টেনে ধরল শিরিন। পুরো একটা ম্যাগাজিন খালি করল সে। সবগুলো বুলেট ইসরায়েলির গলায় আর বুকে লাগল। একই সঙ্গে গুলি করেছে হাসানও, সিঙ্গেল শট–লোকটার হৃৎপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার, লাশটা তারপরও কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল, যেন

ওদেরকে সে মান্য করতে রাজি নয়। তারপর সটান আছাড় খেলো।

টর্পেডো টিউব ধরে কোন রকমে সিধে হলো রানা। চোখের ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতে দেখতে পেল ব্রিজের পিছন থেকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে হাসান। করডাইট, ধোঁয়া, রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধে বমি পেল ওর। বড় করে শ্বাস টেনে তাজা বাতাস ভরল বুকে। তারপর খেয়াল করল ব্যাপারটা—পরিবেশ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, সেটা ভাঙছে শুধু টর্পেডো বোটের গায়ে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ।

'মাসুদ ভাই, লেগেছে?'

আওয়াজটা যেন দীর্ঘ একটা টানেলের অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল। নরম একটা হাত পড়ল ওর কাঁধে। ব্যথায় চোখ-মুখ কুঁচকে ঘাড় ফেরাল রানা। ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিরিন।

হাসতে চেষ্টা করায় শাস্তি পেল রানা, মুখের বাম দিকটা টন টন করে উঠল ব্যথায়। 'হ্যাঁ,' কর্কশ সুরে বলল ও। 'লেগেছে। সারা শরীরে।'

একটা চিৎকার শুনে থেমে গেল রানা, ঘাড় ফেরাল দ্রুত। আঁতকে উঠে লক্ষ করল লড়াই চলার সময় দুটো জাহাজ আলাদা হয়ে গেছে।

আবার চিৎকার করল মোস্তফা। 'এঞ্জিন স্টার্ট দিতে পারবে?'

জবাব দিল নওশাদ। 'দুঃখিত। ওগুলো ভেঙে গেছে।'

গোল্ডামেয়ারের ফোরডেকে নড়াচড়া করছে কেউ, নিশ্চয়ই মোস্তফা হবে। একটু পর আবার তার চিৎকার ভেসে এল, 'ভারী একটা লাইন ছুঁড়ছি। ধরার জন্যে তৈরি থাকো।'

টর্পেডো বোট থেকে ওরা তাকে পিছু হটতে দেখল, একটা হাত মাথার ওপর ঘুরছে। তারপর সাপের মত এঁকেবেঁকে ছুটে এল একটা রশি, দুই জাহাজের মধ্যবর্তী দূরত্ব পার হতে চাইছে। টর্পেডো বোটের ফোরডেকে আছাড় খেলো ওটা, তারপর পিছলে সাগরে পড়ে যাবার উপক্রম করল।

সাদাত ডাইভ দিয়ে ধরে ফেলল রশিটা, তার সঙ্গে যোগ দিল হাসান। রশি নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে, ওরা মরিয়া হয়ে টানছে সেটাকে।

'যেভাবে পারো বাঁধো ওটা,' মোস্তফা বলল। 'তোমাদেরকে পাশে আনার জন্যে উইঞ্চ ব্যবহার করছি আমি।'

পাঁচ মিনিট পর টর্পেডো বোট গোল্ডামেয়ারের গায়ে এসে ঠেকল। ওরা সবাই জাহাজ বদলের অপেক্ষায় রয়েছে, রানাকে হাসান জিজ্ঞেস করল, 'জুবায়েরকে নিয়ে কি করব আমরা?'

বুকে অকস্মাৎ একটা ব্যথা অনুভব করল রানা। জুবায়ের কি মারা গেছে? জিজ্ঞেস করতে ভয় লাগছে ওর। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হাসানের দিকে।

'ও মারা গেছে।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'এঞ্জিন রূমে রেখে এসো। হ্যাচটা শক্তভাবে বন্ধ করবে।'

টর্পেডো বোট থেকে গোল্ডামেয়ারে চলে এল ওরা। সবার শেষে এল হাসান ও নওশাদ। সাদাত মইটা তুলে ভাঁজ করছে। রানা লক্ষ করল, বোটের খোল এরইমধ্যে পানির বেশ খানিকটা নিচে নেমে গেছে।

'সীককগুলো খুলে দিয়েছি আমরা,' বলল হাসান। 'ডুবতে খুব বেশি সময় নেবে না। আপনি যেমন চেয়েছেন, জুবায়েরকে আমরা এঞ্জিন রূমে রেখে এসেছি।'

হাসান থামতেই একটা আতঙ্কিত চিৎকার শোনা গেল। 'ক্যাপটেন!'

সবাই ওরা মুখ তুলে তাকাল। ব্রিজের উইং-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে বাখারা।

'রাডারে দুটো জাহাজ, ক্যাপটেন! এদিকেই আসছে! গতি অসম্ভব দ্রুত!'

'কত দূরে?'

'সাত মাইল। প্রতি মুহূর্তে কমছে।'

মুহূর্তের জন্যে একটা ছবি ভেসে উঠল রানার মনের পর্দায়। রেডিও অপারেটর! দরজায় লাথি মেরে ও যখন ভেতরে ঢুকল, হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে রেডিওর সামনে বসে ছিল সে। লোকটা যদি কোন বিপদ সঙ্কেত পাঠিয়ে থাকে···

মোস্তফার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর।

মাথা নাড়ল মোস্তফা। 'এখুনি আমরা সচল হতে পারি না।' ইঙ্গিতে টর্পেডো বোটটা দেখাল রানাকে। 'ওটা গায়েব না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

টর্পেডো বোটের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ঝকঝকে ধূসর খোল অলস ভঙ্গিতে দোল খাচ্ছে, ঘষা খাচ্ছে গোল্ডামেয়ারের গায়ে। রেইলটা আঁকড়ে ধরল ও, গিঁট সাদা হয়ে গেল, মনে মনে চাইছে এই মুহূর্তে ওটা ডুবে যাক।

'ভেসে থাকার জন্যে লড়ছে ওটা,' শান্ত গলায় বলল মোস্তফা। 'সব জাহাজেরই একই প্রবণতা, সহজে মরতে চায় না।'

ঝট করে তার দিকে ফিরল রানা। 'এ-সব আমি শুনতে চাই না! জাহাজ দুটো ইসরায়েলিদের হোক বা না হোক, রাডারে ওরা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে, কাজেই হাতে বেশি সময় নেই।'

'কি করা উচিত বলে দাও,' ভারী গলায় বলল মোস্তফা।

'একটা লাইনে বাঁধো ওটাকে,' বলল রানা, 'তারপর এঞ্জিন স্টার্ট দাও। যতক্ষণ না ডোবে, টো করে নিয়ে যাব। মুভ, ম্যান, মুভ! সাদাত–সাহায্য করো ওকে। বাকি সবাই আড়ালে চলে যাও। জানশের আর জামালুকে এঞ্জিন রূমে চাই আমি। বাখারা,' গলা চড়াল। 'স্ট্যান্ডবাই! আমি বলামাত্র জাহাজ ছেড়ে দেবে তুমি।' ঘাড় ফেরাল ও। 'হাসান, শিরিনকে নিয়ে এদিকে এসো।'

নির্দেশ পেয়ে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। মোস্তফার পিছু নিয়ে সাদাত গেল ফো'ক্যাসলে, একটা ওয়ায়ার হোজার খুলে আনতে। শিরিন, সোলায়মান আর রাহমানভ মই বেয়ে ওপরে উঠছে। নওশাদ ছুটল রেডিও রূমের দিকে।

হাসান ও শিরিনকে নিচু গলায় কয়েকটা কথা বলল রানা, তারপর চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে ব্রিজে উঠে এল। হুইলহাউসে ঢুকছে, বাখারা হাত তুলে দেখাল। বলল, 'ওদিকে তাকাও, ওগুলোর রানিং লাইট দেখতে পাবে।' রানার হাতে নাইটগ্লাস ধরিয়ে দিল সে।

চোখে তুলে ওটার ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল রানা। অন্ধকার থেকে লাফ দিয়ে সামনে চলে এল একজোড়া সরু আকৃতি, কাঠামোর রেখাগুলো ভীতিকর।

ওরে সর্বনাশ, ওগুলো তো ডেস্ট্রয়ার! ভুল হবার প্রশ্নই ওঠে না। ছুরির ফলার মত ধারাল বো ঢেউ চিরে ছুটে আসছে, ঝর্ণার মত উঁচু হচ্ছে সাগরের পানি, দু'পাশের গা পেন্সিলের মত সরু দেখাচ্ছে, আলোড়িত পানি ও ফেনায় নিচের দিকটা ঢাকা।

'এখন আর মাত্র পাঁচ মাইল দূরে,' বলল বাখারা। 'এই হেডিং বজায় রাখলে আমাদের পোর্ট সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাবে, খুব কাছ দিয়ে।'

'কত কাছ দিয়ে?'

বাখারা কাঁধ ঝাঁকাল। 'হয়তো আধ মাইল।'

নাইটগ্লাস ফিরিয়ে দিয়ে স্টারবোর্ড উইং-এ চলে এল রানা। হাসান ও শিরিন অ্যাকুয়ালাঙ পরে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে লোয়ার ডেকে। রানা জানে ওদের সঙ্গে প্রচুর লিমপেট মাইন আছে। টর্পেডো বোটের ফোরডেকে রয়েছে মোস্তফা, ওয়ায়ার হোজারটাকে ৪-এর আকৃতি দিচ্ছে। আকৃতির মাঝখানে একটা লাইন বেঁধে সিধে হলো, ছুটে চলে এল মইয়ের কাছে, মই বেয়ে গোল্ডামেয়ারে। তারপর মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল।

'বাঁধার কাজ শেষ।'

বন করে ঘুরে হুইলহাউসের দরজা লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা। 'বাখারা! স্টার্ট!'

নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় ছিল বাখারা, ব্রিজ টেলিফোনে দ্রুত কথা বলল। তারপর রিসিভারটা ঝনাৎ করে ক্রেডলে রেখে হুইলের দিকে ছুটল। ওদের পায়ের নিচে কাঁপতে শুরু করল ডেক, এঞ্জিন চালু হয়ে গেছে, শক্তি যোগাচ্ছে প্রপেলারে। ধীর গতিতে সামনে বাড়ল জাহাজ। ওয়ায়ার হোজার-এ টান পড়ায় রশিতে বাঁধা বুনো জন্তুর মত থরথর করে কাঁপছে জাহাজ। তারপর ধীরে ধীরে, খুবই ধীরে ধীরে, আবার সামনে এগোতে পারল। পানিতে ভরাট টর্পেডোবোট চেষ্টা করছে গোল্ডামেয়ারকে ডান দিকে সরিয়ে নিতে। হুইল ঘুরিয়ে বাম দিকে থাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল বাখারা।

ব্রিজের উইং-এ পৌঁছুল মোস্তফা, কিনারা থেকে নিচে তাকাল। 'এ তো কাছিমের স্পীড!'

'স্থির হয়ে থাকার চেয়ে ভাল,' জবাব দিল রানা।

ডেস্ট্রয়ার দুটো এখন এক মাইলের কিছু বেশি দূরে। একজোড়া এক্সপ্রেস ট্রেইনের মত ছুটে আসছে।

'বাড়িতে কে কে আছে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

'বুড়ি মা আর দুই বাচ্চা,' বিড়বিড় করল মোস্তফা। 'বউ কিছুদিন হলো মারা গেছে। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন, ভাই?'

'বুঝতে পারছ না, আমরা মারা যাচ্ছি?' রানার ঠোঁটে ক্ষীণ, তিক্ত এক চিলতে হাসি। 'চিন্তা কোরো না, সব ব্যবস্থা করা আছে, ক্ষতিপূরণের টাকা তোমার মায়ের কাছে পৌঁছে যাবে।'

হঠাৎ হেসে উঠল মোস্তফা। 'মৃত্যুভয় আমাকে কাবু করতে পারে না। আমি কখনও মানুষ মারিনি, স্রেফ ক্ষতিকর আবর্জনা সাফ করেছি। সৃষ্টিকর্তা যদি থাকেন, তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার পাবার কথা আমার। তোমার প্রস্তাবে এই

মিশনে আসতে রাজি হয়েছিলাম শুধু একটা কারণে। জানতাম, এমন ব্যবস্থা করা হবে, এমনকি তুমি মারা গেলেও ক্ষতিপূরণের টাকাটা আমার বাচ্চারা পাবে।' একটু থেমে সে-ও একটা প্রশ্ন করল, 'তোমার ব্যাপারটা কি, ভাই? তোমার কে আছে?'

অকস্মাৎ রানার গোটা জগৎ যেন ফাঁকা হয়ে গেল। আশ্চর্যই বলতে হবে, এই প্রশ্ন আগে কেউ এভাবে করেছে বলে মনে পড়ে না। কঠিন প্রশ্ন। ওর কে আছে? ওকে ভালবাসে, ওর জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, এমন লোকের অভাব নেই। তারা কেউ বন্ধু, কেউ শুভানুধ্যায়ী, কেউ ভক্ত। তাদেরকে আপনজন বলে ভাবা যায়, যদিও আসলে আপনজন অবশ্যই নয় তারা। তাদের কারও সঙ্গে ওর রক্তের সম্পর্ক নেই। 'রক্তের সম্পর্ক নাই থাকুক, কারও সঙ্গে ওর এমনকি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কও নেই। ব্যক্তিগত জগৎটা তন্নতন্ন করে খুঁজল রানা, সেখানে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না। 'আমি একা, আমার কেউ নেই,' বিড়বিড় করল ও, তাতে যদি নিজের প্রতি ক্ষোভ থাকেও, তারচেয়ে বেশি আছে অভিমান—তবে সে অভিমান কার প্রতি তা নিজেও জানে না।

'মুক্তবিহঙ্গ, হ্যাঁ?' হাসছে মোস্তফা।

কঠিন দৃষ্টিতে টর্পেডো বোটের দিকে তাকাল রানা। বোটের ডেক ডুবে গেছে। খোলা ব্রিজে আছড়ে পড়ছে সাগর। প্রচণ্ড চাপ পড়ায় টান টান হয়ে আছে হোজার বার।

'আর বেশি দেরি নেই,' বিড়বিড় করল মোস্তফা।

ডেস্ট্রয়ার দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। গোল্ডামেয়ারের কাছ থেকে আর আধ মাইল দূরেও নয় ওগুলো। অকস্মাৎ কর্কশ একটা আওয়াজ হলো। প্রচণ্ড টান সহ্য করতে না পেরে বিট ছিঁড়ে ফেলেছে হোজার, টর্পেডো বোটের বোর কাছে ডেকের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ভারমুক্ত হয়ে ঝাঁকি খেলো গোল্ডামেয়ার, লাগাম ছাড়া ঘোড়ার মত ছুটল, আধ ডোবা টর্পেডো বোটকে ধাক্কা দিয়ে ডোবাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। বন বন করে স্টারবোর্ডের দিকে হুইল ঘোরাচ্ছে বাখারা, মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে ছেষট্টি টন স্টীল যাতে গোল্ডামেয়ারের প্রপেলার গুঁড়িয়ে দিতে না পারে।

ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ কানা করা উজ্জ্বল আলোর একটা বন্যা আছড়ে পড়ল ওদের ওপর, কামানের গোলার মতই নিক্ষিপ্ত হয়েছে সামনের ডেস্ট্রয়ারটা থেকে। রানা ও মোস্তফা, দু'জনেই হাত তুলে চোখ ঢাকল, তারপর আলোর উৎসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। গোল্ডামেয়ারের পিছনে টর্পেডো বোটের স্টার্ন সাগরের ওপরে খাড়া হয়ে রয়েছে, হেরে যাবার পর অভিযোগ জানাবার ভঙ্গি। এখনও ওটা ডুবছে না, বোবা সাক্ষী হিসেবে সারফেসের ওপর জেগে আছে।

'ডোব শালা! ডোব!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রানা, হতাশায় ব্রিজ উইং-এর কাঠের রেইলিঙে ঘুসি মারল।

স্টার্ন-এর চারপাশের পানিতে বিশাল একটা বুদ্বুদ বিস্ফোরিত হলো, পরমুহূর্তে স্টার্ন ডুবে গেল পানির নিচে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর আলোড়িত পানির ওপর আছড়ে পড়ল ডেস্ট্রয়ারের সার্চ লাইট। পরমুহূর্তেই নিভে গেল সেটা।

উইং-এর সাইডে হেলান দিল রানা, হঠাৎ স্বস্তি বোধ করায় তুলোর মত হালকা লাগছে শরীরটা। ইচ্ছা হলো এখুনি ঘুমিয়ে পড়ে। চোখ তুলে মোস্তফার দিকে তাকাল ও। দীর্ঘ একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমাদের ভাগ্যটা আজ ভালই মনে হচ্ছে, কি বলো?'

'না রে, ভাই, এখনও আমাদের বিপদ কাটেনি।'

'তোমার ধারণা বিপদ একা শুধু আমাদের?' হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'একজন মার্সেনারি হয়ে এ-কথা তুমি ভাবতে পারলে কিভাবে?' দ্রুত পা চালিয়ে হুইলহাউসে ঢুকল ও।

হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মোস্তফা। এক মুহূর্ত পর সে-ও হুইলহাউসে ঢুকল। কম্পাসের কাছে থামল সে, সেটা কিছুক্ষণ দেখল, তারপর বলল, 'এভাবেই চলুক, বাখারা। নতুন হেডিং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানাচ্ছি তোমাকে।'

ওদের সামনে অন্ধকার, ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর একজোড়া গ্রেহাউন্ড ওদের পাশ কাটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আমার ভুলটা কোথায় হলো, ধরিয়ে দাও, ভাই,' রানার পাশে এসে ফিসফিস করল মোস্তফা।

'আমরা এ-যাত্রা রক্ষা পেয়েছি,' বলল রানা। 'কিন্তু ডেস্ট্রয়ার দুটোও রক্ষা পেয়েছে, মোস্তফা।'

'মানে?'

'আমাদের দলে দু'জন ডাইভার আছে, তুমি জানো?'

মাথা নাড়ল মোস্তফা।

'হাসান আর শিরিন,' বলল রানা। 'ডেস্ট্রয়ার দুটো থামলে ওরা গোল্ডামেয়ার থেকে নেমে যেত। অ্যাকুয়ালাঙ পরে তৈরি হয়েই ছিল ওরা। সঙ্গে ছিল প্রচুর লিমপেট মাইন।'

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল মোস্তফার। 'তুমি, ভাই, ইসরায়েলিদের দু'দুটো ডেস্ট্রয়ার ডুবিয়ে দিতে?'

'পাগল ছাড়া এ-প্রশ্ন কেউ করে!' বলে হেসে উঠল রানা। 'জান বাঁচানো ফরজ না?'

এমন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মোস্তফা, রানাকে যেন চিনতে পারছে না।

নয়

ইউ.এস. এয়ারফোর্স-এর টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চ প্রতিটি মিসাইল একটা প্যাকেজে ভরে ইসরায়েলিদের হাতে তুলে দিয়েছে। প্যাকেজটা তিনভাগে বিভক্ত—ফার্স্ট ফোর-ফিনড্ বুস্টার প্রপালশন ইউনিট ও কমবাইন্ড সেকেন্ড স্টেজ বুস্টার; গাইডেন্স সিস্টেম; ওঅরহেড ও নোজ কোন। এগুলো পরে বিশেষভাবে তৈরি ফাইবার গ্লাস ক্রেইট কন্টেইনারে ভরা হয়েছে। সবশেষে ঠাঁই পেয়েছে শক্ত কাঠের একটা ক্রেইটে। তবে গোল্ডামেয়ারের ফোরডেকে যা ঘটল তার সঙ্গে দুর্ঘটনার

কোন সম্পর্ক নেই, বাংলাদেশী দুই কৃতি সন্তানের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল বলা যেতে পারে।

জড়ানো কেইবল খুলে তারপুলিন সরাতে হলো, ক্রেইট ভেঙে সর্বশেষ খোলস ইনার কন্টেইনার ছাড়াতে হলো, সময় লাগল পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ঘেমে সারা হলো ওরা, কয়েক জায়গায় হাত-পা কাটল, খাটনি বেশি পড়ে যাওয়ায় গাল দিল কপালকে। অবশেষে সুদূর ইসরায়েল ঘুরে আমেরিকা থেকে আসা লেটেস্ট টেকনোলজিক্যাল খেলনাটা চোখের সামনে দেখতে পেল ওরা।

'মাসুদ ভাই, এগুলোর সঙ্গে ইন্সট্রাকশন বুক নেই?' জিজ্ঞেস করল হাসান, হাঁপাচ্ছে।

ক্রেডলে তিনটে 'স্নিফার'-এর সেকশন আলাদাভাবে পড়ে আছে, বার্নিশ করা ব্রোঞ্জ-এর মত চকচক করছে চাঁদের আলোয়। সরু নোজ কোন আর হাঙর-সদৃশ ফিন লাগানো রিয়ার বুস্টার এক লাইনে থাকায় মনে ভয় মেশানো একটা বিস্ময় জাগল, ওরা উপলব্ধি করল ভীতিকর একটা জিনিস দেখতে সুন্দরও হতে পারে।

'মাসুদ ভাই, কাজটা আমরা ঠিক করছি তো?' জিজ্ঞেস করল হাসান।

রানা গম্ভীর। জবাব দিল এক সেকেন্ড পর। 'নতুন গাইডেন্স সিস্টেম আমরা ওদেরকে দিচ্ছি না। ওঅরহেডটা পাবে, তবে নিউক্লিয়ার হলে ওটাও পেত না।'

'নতুন গাইডেন্স সিস্টেমটাই লিবীয়ানদের দরকার, তাই না?' সংক্ষেপে আগেই সব ব্যাখ্যা করেছে রানা, তবু ব্যাপারটা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে চাইছে হাসান। 'তাহলে কেন ওটা পাবে না ওরা? আপনার সন্দেহ যদি সত্যি না হয়?'

'হ্যাঁ, আমার একটা সন্দেহ আছে। কিন্তু সেটা সত্যি না হলেও গাইডেন্স সিস্টেমটা ওদেরকে আমরা দিতে পারি না। লিবীয়ার ওটা পাওয়ার মানে দাঁড়াবে, সিস্টেমটা আন্তর্জাতিক মৌলবাদী টেরোরিস্টদের হাতে তুলে দেয়া। সারা দুনিয়ায় যেখানে যত আন্তর্জাতিক টেরোরিস্ট আছে, সবার জন্যে লিবীয়া নিরাপদ আশ্রয়। আমরা লিবীয়াকে দেব, কিন্তু লিবীয়া ওটা নিজের কাছে রাখতে পারবে না—তাই দেব না।'

'আপনি প্রথম থেকেই একটা সন্দেহের কথা বলে আসছেন। সেটা যদি সত্যি না হয়? মিসাইল পেয়ে চেক করবে ওরা, গাইডেন্স সিস্টেম না থাকার কি ব্যাখ্যা দেব আমরা?' কঠিন প্রশ্নটা সবার শেষে জিজ্ঞেস করল হাসান।

রানা বলতে যাচ্ছিল, আমার সন্দেহ সাধারণত ভুল হয় না, তবে তা বলল না। বলল, 'যা পেয়েছি তাই নিয়ে এসেছি। যে জিনিস নেই, তা আমরা আনব কোত্থেকে?'

দু'জনেই ওরা হেসে উঠল।

ক্যাপটেন বেন দাইয়ানের কেবিন, দোরগোড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নওশাদ। রেডিও রুম থেকে ভেসে আসা যান্ত্রিক শব্দ-কোলাহল শুনছে এক কানে, আরেক কানে ক্যাপটেন আর তাঁর স্ত্রীর আলাপ।

বাঙ্কে শুয়ে আছেন মহিলা; ক্লান্ত, দুর্বল, তবে মুখে হাসি। একটা ডেক চেয়ারে বসে স্ত্রীর ওপর ঝুঁকে আছেন দাইয়ান, হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মাথায়।

'সিগারেট?' দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল নওশাদ।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। ধীরে ধীরে আক্রোশ আর ঘৃণা ফুটল চোখে-মুখে। জবাব না দিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

'আপনি আমার ওপর শুধু শুধু রেগে আছেন,' বলল নওশাদ। 'ঠিক আছে, ধরে নিলাম আপনার স্ত্রীকে গুলি করাটা আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু আমার লীডার মাসুদ রানা কি ইতিমধ্যে সেই ভুল সংশোধন করেননি?'

'আমি শুধু তাঁর সঙ্গে কথা বলব,' বললেন দাইয়ান। 'তিনি আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তুলেছেন, সেজন্যে তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তবে তারমানে এই নয় যে আপনাদের এই বেআইনী কাজ আমি মেনে নেব।'

'মেনে না নিয়ে আপনার উপায় কি?' জিজ্ঞেস করল নওশাদ। 'তাছাড়া, কে বলল আমরা বেআইনী কাজ করছি? মিসাইলগুলো কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে, মি. বেন দাইয়ান? আপনারা আরবদের তেলখনি ধ্বংস করার প্রস্তুতি নেবেন, যুদ্ধ বাধিয়ে পাইকারী হারে নিরীহ মানুষ মারার আয়োজন করবেন, আর আমরা চোখ বুজে থাকব?'

'আক্রমণ ঠেকাবার অধিকার সবার আছে,' বললেন দাইয়ান। 'আমরা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। যদি ভেবে থাকেন এই অপরাধ করে আপনারা বেঁচে যাবেন...'

এই সময় কেবিনে ঢুকল শিরিন। 'এখানে এত চেঁচামেচি কিসের? ভুলে যাবেন না, এখানে একজন রোগিনী আছেন...'

দরজার কাছ থেকে সরে গেল নওশাদ।

হুইল হাউসের ঘড়িতে বাইশ ঘণ্টা। ঘড়ি থেকে চোখ নামিয়ে মোস্তফার দিকে তাকাল বাখারা, সে পাশেই দাঁড়িয়ে। এই বাইশ ঘণ্টাতেই গোল্ডামেয়ারের সঙ্গে রনদেভো ঠিক করা আছে হেলিকপ্টারের।

'হ্যাঁ।' মোস্তফা জানে বাখারার দৃষ্টি কি বলতে চাইছে। 'এই স্পীডে কম করেও আরও এক ঘণ্টা।'

'তোমার কি ধারণা, ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে?'

'অবশ্যই অপেক্ষা করবে, বাখারা,' জোর দিয়ে বলল মোস্তফা। 'হেলিকপ্টারে রানা এজেন্সির লোকজন আছে।' জানালা দিয়ে ফোরডেকে ব্যস্ত অস্পষ্ট একজোড়া মূর্তির দিকে তাকাল। ওখানে এখনও কাজ করছে রানা ও হাসান। 'আমি হেলিকপ্টার নিয়ে চিন্তিত নই, চিন্তিত সাবমেরিন নিয়ে।'

এবার মোস্তফাকেই অভয় দিল বাখারা। 'লিবীয়ানদের মিসাইলটা দরকার, কাজেই সাবমেরিনও আসবে।'

এগিয়ে এসে ব্রিজ টেলিফোনটা তুলল মোস্তফা। যতই জোর দিয়ে বলুক, সে জানে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় ওদেরকে না পেলে পাইলট ফিরে যেতে বাধ্য হতে পারে। রনদেভোটা যে-কোন বন্দর বা সৈকত থেকে দূরে, ইচ্ছে থাকলেও পাইলট ফুয়েলের অভাবে বেশিক্ষণ ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে পারবে না।

জানশের এঞ্জিন রূমে রয়েছে, মোস্তফার নির্দেশ শুনে জবাব দিল, 'ঠিক

আছে, চেষ্টা করছি।' কন্ট্রোল প্যানেলের সারি সারি ডায়ালের ওপর দৃষ্টি বোলাল, চোখ দুটো কুঁচকে আছে। 'তবে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। ফুলস্পীডেই যাচ্ছি আমরা।'

রিসিভার রেখে দিয়ে জামালুর দিকে তাকাল জানশের। 'ব্রিজ আরও বেশি স্পীড চাইছে।'

ক্যাটওয়াকে, তার পাশে চলে এল জামালু। সালজার এঞ্জিনের দিকে একটা হাত তুলে বলল, 'কি অবস্থা ওটার, দেখতে পাচ্ছ না? ইসরায়েলিরা এটাকে বেশ্যার মত ব্যবহার করেছে, রাখেনি কিছু। এই এঞ্জিন থেকে আরও স্পীড কি করে পাবে?'

জামালুর উপমা শুনে নিঃশব্দে হাসল জানশের, হাত বাড়াল থ্রটলের দিকে। 'এসো দেখা যাক বেটির কাছ থেকে এর বেশি কিছু আদায় করা যায় কিনা।' লিভারটা শক্ত করে ধরে, বিরতিগুলোতে না থেমে গায়ের জোরে ঠেলে দিল সামনে। অকস্মাৎ অতিরিক্ত শক্তি পেয়ে কেঁপে উঠল গোল্ডামেয়ার, মরচে ধরা বো লম্বা ঢেউগুলোকে অনায়াসে দু'ভাগ করে ছুটে চলেছে।

ফোরডেকে হাসান নেই, তার বদলে রানাকে সাহায্য করছে সাদাত ও সোলায়মান। 'স্নিফার'-এর চার ধারে স্টীল-মেশ কার্গো নেট জড়াচ্ছে ওরা।

স্টারবোর্ড অ্যাংকার চেইন-এর ঢাউস লিঙ্কগুলো হাসানের পায়ের নিচে সারাক্ষণ নড়াচড়া করছে, ঢেউয়ের তালে তালে জাহাজের দ্রুত উত্থান-পতন কাজ করার জন্যে বিপজ্জনক করে তুলেছে প্ল্যাটফর্মটাকে। ডেকহেডের নিচে সিধে হয়ে দাঁড়ানোর উপায় নেই, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কুঁজো হয়ে রয়েছে, ইন্সপেকশন-প্লেটের ফাঁক দিয়ে টর্চের আলো ফেলছে সামনের ফোরপীক-এ। চঞ্চল আলোটা অবশেষে খুঁজে পেল বারুদ লাগানো কর্ডটাকে, এই কর্ডই এক নম্বর হোল্ড থেকে এদিকে টেনে এনেছিল সে। হাত বাড়িয়ে ধরতে যাবে, ঢেউয়ের মাথা থেকে নিচে গোত্তা খেলো জাহাজ। অ্যাংকার চেইন হয় হোল থেকে হুড়মুড় করে পানি ঢুকল, এক পাশে ঠেলে দিল হাসানকে। পাশের একটা ভার্টিক্যাল বীম-এর কিনারা ধরে কোনরকমে ঝুলে থাকল ও। খোল সিধে হতে আবার সব পানি বেরিয়ে গেল হয় হোল দিয়ে।

কুকুরের মত শরীরটা ঝাঁকাল হাসান, তারপর ফাঁকের ভেতর হাত গলিয়ে কর্ডটা ধরে চেইন লকারে নিয়ে এল। ঘড়ির ওপর টর্চ ধরতে আশ্চর্য হয়ে গেল। এখানে নামার পর পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে! যেভাবে হোক আর আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজটা শেষ করতে হবে তাকে। টর্চটা বেল্টে আটকে পকেট থেকে একজোড়া প্লায়ার্স বের করল, বাল্কহেডের গায়ে শরীরটা গুঁজে দেয়ার ভঙ্গিতে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। কর্ডের প্রান্তটা চিরে দু'ভাগ করার পর টাইমিং ডিভাইসটা বের করল, কর্ডের প্রান্ত দুটো আটকাল স্প্রীং ক্লিপে। টাইমিং ডিভাইসটা সিগারেট প্যাকেটের চেয়ে বড় নয় আকারে। টাইমারের ম্যাগনেটিক পিঠে প্রোটেকটিভ টেপ লাগানো আছে, খুলে নিয়ে ডিভাইসটা ইন্সপেকশন-প্লেট ওপেনিং-এর নিচের বাল্কহেডে আটকাল। এ পর্যন্ত সবই প্রথাসিদ্ধ নিয়ম ধরে করা হয়েছে। মূল

সমস্যার সমাধান কিভাবে করতে হবে সে-সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। গোল্ডামেয়ার বিস্ফোরিত হবে নিজের গন্তব্যে পৌঁছানোর পরে, আগে নয়—সমস্যা হয়ে দেখা দেয় রানার এই নির্দেশ।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সেটা কোন সমস্যা হত না। কিন্তু এখানে অসুবিধে হলো, জানার কোন উপায় নেই গোল্ডামেয়ার ঠিক কখন বা কবে ডকে ভিড়বে। অথচ টাইমিং-এ খুঁত থাকলে চলবে না। ডকে ভেড়ার পর সময়ের মার্জিন রাখা যাবে খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টা। এরচেয়ে বেশি সময় লাগলে বিস্ফোরকগুলো কারও চোখে পড়ে যেতে পারে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েও কোন লাভ হয়নি। অবশেষে মুখ ফুটে নিজের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করতে হয়েছে রানার কাছে। হাসান জানত না, এই সমস্যার সমাধান আগেই করে রেখেছে রানা। ওকে কোন প্রশ্ন না করায় ধরে নিয়েছিল হাসান নিজেই বুদ্ধি খাটিয়ে সমাধানটা পেয়ে গেছে।

কাজটা পানির মত সহজ। এই কাজের জন্যেই আমস্টারডাম থেকে ষাট ফুট মাউন্টিনিয়ার নাইলন ক্লাইম্বিং রোপ কিনেছিল রানা। সেই নাইলনের রশির একটা প্রান্ত হাসান টাইমারের পাশের একটা বোল্ট হোলে ঢুকিয়ে, টেনে বের করে আনল উল্টোদিকের আরেক বোল্ট হোল দিয়ে। জুতোর ফিতে বাঁধার মত করে, একই কাজ আরও দু'বার করল সে, নিশ্চিত হয়ে নিল টেনে নিচে নামানো ও টেপ দিয়ে আটকানো টাইমারের ট্রিপ লিভারের ওপর রশিটা যেন টান টান হয়ে থাকে। সবশেষে রশিটা তৃতীয় একটা বোল্ট হোলে বাঁধল। রশির অপর প্রান্ত রয়েছে স্টীলের একটা ফুটোয়, তাতে আটকাল একটা গ্র্যাপনেল, হুকগুলো শ্যাঙ্ক-এ ভাঁজ করা। এটা সতর্কতার সঙ্গে ফোরপীকে নামাল, তারপর নিচে ফেলে দিল রশির বাকিটুকু। আপাতত আর কিছু করার উপায় নেই তার। শেষ কাজটা সারতে হবে জাহাজ ত্যাগ করার সময়।

সারা শরীর আড়ষ্ট, স্প্রিঙ ঠাসা হ্যাচ কাভার সরিয়ে ফো'কাসলে উঠল হাসান, দরদর করে ঘামছে। হ্যাচ বন্ধ করে বেরিয়ে এল ডকে।

ব্রিজের ঠিক নিচে তার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। 'গ্রিজে গড়াগড়ি খেয়েছ মনে হচ্ছে?'

জোর করে হাসল হাসান।

'তোমার কাজ শেষ?'

'আর মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে। আমরা জাহাজ থেকে নেমে যাবার আগে।'

'গোসল করে কাপড় পাল্টাও,' বলল রানা। 'আমি ব্রিজে যাচ্ছি।'

চোখে নাইট গ্লাস, রাতের সাগরে আরেকবার চোখ বোলাচ্ছে মোস্তফা। স্টারবোর্ড থেকে পোর্ট, একশো আশি ডিগ্রী কাভার করল। অন্ধকার দিগন্তে খুদে বিন্দুর মত একটা নেভিগেশনাল লাইট ছাড়া, সাগরে গোল্ডামেয়ার একা। ক্লান্ত ভঙ্গিতে গ্লাস নামিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো রগড়াল সে।

'আশা করছি ক্যাপটেন কিছু শোনাবে।'

চমকে উঠে ঘুরল মোস্তফা। স্টারবোর্ড উইং-এর ব্রিজে, নিঃশব্দ পায়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। মাথা নাড়ল মোস্তফা। 'কি ঘটছে বুঝতে পারছি না।'

রনদেভো থেকে পাঁচ কি ছয় মাইল দূরে রয়েছি আমরা, অথচ এখনও কিছু চোখে পড়ছে না।'

'হেলিকপ্টারে আমাদের লোকজন আছে,' বলল রানা। 'পৌছুতে দেরি হলেও ওরা অপেক্ষা করবে। অবশ্য যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে আলাদা কথা।'

পৌছুতে দেরি হলেও ওরা অপেক্ষা করবে?' মোস্তফা গম্ভীর। 'ফুয়েল শেষ হয়ে আসছে দেখেও?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা। অর্থাৎ নিজের লোকজনের ওপর অবিচল আস্থা রাখে ও।

ঠিক এই সময় এঞ্জিনের পরিচিত শব্দ হঠাৎ করেই থেমে গেল। সেই সঙ্গে কেঁপে উঠল হুইল হাউসের আলো, তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ছুটে ভেতরে ঢুকল রানা, পিছু নিয়ে মোস্তফাও।

'পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে,' গলা চড়িয়ে জানাল বাখারা। 'হেলম ঘোরালেও জাহাজ সাড়া দিচ্ছে না।'

ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে মোস্তফা, ব্রিজ টেলিফোনের দিকে ছুটল। রিসিভার তোলার আগেই বেজে উঠল সেটা। সেই সঙ্গে অন্ধকার হয়ে গেল ব্রিজ।

'কি ঘটল?' রিসিভারে চিৎকার করছে মোস্তফা।

উত্তরটা শোনার সময় নিচের ঠোঁট এত জোরে কামড়ে ধরল, মুখের ভেতর রক্ত চলে এল। ক্রেডলে রিসিভারটা ঝনাৎ করে নামিয়ে রানার দিকে ঘুরল সে। 'এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। ওটা আর চলবে না। ওরা ইমার্জেন্সী জেনারেটর স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করছে।'

তিনজনই ওরা অনড়, অনুভব করছে জাহাজের গতি মন্থর হয়ে আসছে। আবার অচল হয়ে পড়ছে ওরা।

'টর্চ!' রানার গলা কর্কশ।

আশপাশে হোঁচট খাচ্ছে মোস্তফা, অসহিষ্ণু রানা অপেক্ষা করছে। তারপর একটা টর্চ জ্বলল, নিস্তব্ধ হুইল হাউসে কিম্ভূতকিমাকার ছায়া তৈরি করছে। 'ধরুন,' বলে রানার হাতে দ্বিতীয় টর্চটা ধরিয়ে দিল মোস্তফা। 'এই দুটোই আছে।'

তাড়াতাড়ি পোর্ট উইং-এ চলে এল রানা। জাহাজের মন্থর গতি ক্রমশ আত্মসমর্পণ করছে প্রবলপ্রতাপ সাগরের কাছে। প্রতিবাদের সুরে গোঙাচ্ছে হাল প্লেট। কোথাও একটা দরজা একঘেয়ে শব্দে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে বারবার। হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ও, যেন মাকড়সার জালে আটকা পড়া একটা পোকা। মাকড়সা হলো সোকোট্রা দ্বীপ, ওটার বিষ যে-কোন ব্ল্যাক উইডোর চেয়েও মারাত্মক। চারপাশের সমস্ত শব্দ কান থেকে বের করে দিয়ে নতুন একটা শব্দ শোনার জন্যে মনোযোগী হলো ও। চিন্তা করছে, চিনুকে রানা এজেন্সির পাইলট থাকার কথা। ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াৎ ফারাজি নিজেই প্রস্তাবটা দিয়েছিল, তাই না? সেকি শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টেছে? চিনুকে যদি তার লোকজন থাকে, ওদের পৌছুতে দেরি হচ্ছে দেখলে তারা কি ফিরে যাবে? না, তা কি করে হয়। মিসাইলটা ওদের খুবই দরকার।

এক সেকেন্ডের জন্যে টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখল রানা। বাইশ ঘণ্টা ছেচল্লিশ

মিনিট। সময়ের হিসেবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পিছিয়ে আছে ওরা, পৌঁছেছে রনদেভো থেকে পাঁচ মাইল দূরে। নাহ, চিনুকের অপেক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না! পাইলট রানা এজেন্সির লোক হলেই বা কি, তাকেও তো ফুয়েলের হিসাব করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পার হবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরও যদি ওদেরকে দেখতে না পায়, বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার কথা ভাববে সে। যদিও এখন আর তার পক্ষে ওমানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, ফুয়েলে কুলাবে না। তবু আত্মরক্ষার জন্যে সাগরেই কোন জাহাজ খুঁজবে সে–মিশরীয় বা সৌদি–বিপদের কথা জানিয়ে ল্যান্ড করার অনুমতি চাইবে, রনদেভো থেকে অনেক দূরে।

আবার ঘড়ির দিকে তাকাতে শিরিনের কথা মনে পড়ে গেল রানার। মেয়েটা ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে, অথচ একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। তিক্ত হাসি ফুটল ঠোঁটে। এখন আর এ-সবের কোন গুরুত্ব নেই।

ওর পিছনে হুইলহাউসের আলো টিমটিম করে জ্বলে উঠল, তারপর অকস্মাৎ চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতা পেল, সবশেষে স্বাভাবিক হয়ে এল। ভেতরে ঢোকার জন্যে ঘুরল রানা, তখনই শুনতে পেল। মৌমাছির মত একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। কান খাড়া করল, বাকি অন্য সব শব্দ থেকে ওটাকে আলাদা করতে চাইছে। পাগল করা একটা অনিয়মিত ধারায় আওয়াজটা বাড়ছে, কমছে, সম্পূর্ণ হারিয়ে যাচ্ছে, তারপর আবার ফিরে আসছে। এবার আগের চেয়ে একটু যেন বেশি জোরালো। কি শুনতে পাচ্ছে বুঝতে পারল ও–সার্চ প্যাটার্ন অনুসরণরত একটা হেলিকপ্টার। শত্রু, নাকি মিত্র, বোঝার কোন উপায় নেই। অন্তত যতক্ষণ না পাইলট ওদেরকে খুঁজে পায়।

মোস্তফা ও বাখারা উইং-এ বেরিয়ে এসে ওর দু'পাশে দাঁড়াল। মোস্তফার চোখে নাইটগ্লাস, অন্ধকার আকাশে চষে বেড়াচ্ছে ওর দৃষ্টি। 'ওই!' নাইটগ্লাস রানার হাতে ধরিয়ে দিল, হাত তুলে পোর্ট বোর সামনেটা দেখাল।

কয়েক মুহূর্ত কিছুই রানা দেখতে পেল না। দৃষ্টি আরও নিচে নামাতে চোখে পড়ল। দু'হাজার গজ দূরে ওটা। গাঢ় একটা আকৃতি। ওদের দিকেই আসছে। আকৃতিটা দ্রুত স্পষ্ট হতে শুরু করল। উঁচু টেইল-ফিন আর জোড়া রোটর, চিনতে পারার জন্যে এগুলোই যথেষ্ট। সি-এইচ-ফরটিসেভেন চিনুক। আমেরিকানদের পুরানো মডেলের একটা হেলিকপ্টার। খাইবার পাসের চোরা বাজারে দু'একটা আজও কিনতে পাওয়া যায়।

রোটর ব্লেডের একঘেয়ে আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে, ধীরে ধীরে বাকি সব শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে।

চোখ থেকে গ্লাস নামিয়ে রানা বলল, 'এটাই।'

মোস্তফার মুখে চওড়া হাসি। 'আমার সন্দেহ ছিল। সেজন্যে দুঃখিত।'

'সন্দেহ আমারও ছিল,' গম্ভীর সুরে বলল রানা, 'এখনও পুরোপুরি দূর হয়নি। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। কখন কি ঘটে যায়।'

চোখ তুলে প্রকাণ্ড হেলিকপ্টারটার দিকে তাকাল রানা, এই মুহূর্তে সেটা ওদের মাথার একশো পঞ্চাশ ফুট ওপরে স্থির হয়ে রয়েছে। হাতের টর্চটা সেদিকে তাক করে সুইচ টিপে সঙ্কেত দিল সে–একটা দীর্ঘ, দুটো সংক্ষিপ্ত, দুটো দীর্ঘ।

পোর্ট সাইডে সরে এল চিনুক, ঝপ করে আরও নিচে নামল—ব্রিজের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায়, মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে। খোলা দরজায় দেখা যাচ্ছে এক লোককে।

'আপনাদের এত দেরি হলো কেন?' বুলহর্নের আওয়াজ প্রায় যান্ত্রিক হলেও গলাটা চিনতে পারল রানা। 'মাসুদ ভাই, আমি ফিউরি। আপনি নির্দেশ দিলেও, অতিরিক্ত ফুয়েল নেয়ার সুযোগ পাইনি আমরা। আপনাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। সবাই তৈরি হয়ে থাকলে একবার টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিন।'

রানার হাতে টর্চটা একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

'সঙ্কেত পেয়েছি। এখন আমরা আপনাদের মাথার ওপর আসছি। প্রথমে একটা মই নামিয়ে দিই, আপনারা উঠে আসুন, প্রতিবার একজন করে। তারপর উইঞ্চের সাহায্যে কেইবল্ নামাব, ওই কেইবল্ দিয়ে মিসাইলটাকে জড়াতে হবে। মিসাইল রেডি তো? একবার জ্বালুন, মাসুদ ভাই।'

টর্চ জ্বেলে মোস্তফার দিকে ফিরল রানা। 'এঞ্জিন রূমে যারা আছে তাদেরকে ডেকে নাও। তোমরা দু'জন ডেক ছেড়ে নড়বে না।' মইয়ের দিকে এগোল ও, রেইলটা দু'হাতে ধরে বোট ডেকে নেমে এল।

নামতেই দেখল সাদাত আর সোলায়মান ছুটে আসছে। 'থামো! আমি চাই সবার আগে কপ্টারে উঠবে তোমরা। চেক করবে, রানা এজেন্সির লোকজন ছাড়া ওখানে অন্য আর কেউ আছে কিনা। 'পাইলটকে জিজ্ঞেস করবে রাবার বোট এনেছে কিনা। আনলে বাতাস ভরতে হবে।'

কোমরের রিভলভারে হাত চাপড়াল সাদাত। 'ও-কে, লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার!' রেডিও রূমের দিকে ছুটল রানা। সেটা খালি পেল ও। প্যাসেজের আরও সামনের দিক থেকে নওশাদ গলা চড়িয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'আমি এখানে, ক্যাপটেনের সঙ্গে।'

'শক্ত করে বাঁধো ওঁকে,' নির্দেশ দিল রানা, তারপর আঙুল তুলে রেডিও রূমটা দেখাল। 'সমস্ত ইকুইপমেন্ট গুঁড়িয়ে দিয়ে ওপরে উঠে যাবে।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ফোরডেকের উদ্দেশে ছুটল আবার।

অত্যন্ত সাবধানে নিজেকে চেইন লকারে নামিয়ে আনল হাসান। জাহাজ দুলছে, ফলে ওর শরীরের নিচে মরচে ধরা লিঙ্কগুলো প্রকাণ্ড এক সাপের মত মোচড় খাচ্ছে। পদক্ষেপে একটু ভুল হলেই হয়, একটা পা রক্তাক্ত ছাতু হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে ইন্সপেকশন-প্লেট ওপেনিং-এর কাছে চলে এল সে, টর্চের আলো ফেলে তাকাল টাইমারটার দিকে। এখনও সেটা জায়গামত শক্তভাবে সেঁটে আছে। পেট আর বেল্টের মাঝখানে টর্চটা গুঁজে রেখে ফোরপীক থেকে গ্র্যাপনেল সহ নাইলন রশিটা টেনে তুলল। পোকার মত চার হাত-পায়ে পিচ্ছিল চেইনটাকে টপকে এল। জাহাজের সাইডে পৌঁছুতে সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল, পা দুটোকে মনে হলো রাবারের তৈরি। একটু থেমে বিশ্রাম নিচ্ছে। এই মুহূর্তে দুনিয়ার সবচেয়ে নিঃসঙ্গ মানুষ মনে হলো ওর নিজেকে।

মন থেকে সমস্ত ভয় ঝেঁটিয়ে বিদায় করে কাজে হাত দিল হাসান। শরীর খানিকটা বাঁকা করে হাত বাড়াল, গ্র্যাপনেলটা ঢুকিয়ে দিল অ্যাংকার স্টক-এর

সামনের হয় হোলে। গ্র্যাপনেল শাঙ্ক-এর স্টাড-এ চাপ দিতেই অনুভব করল বাঁকা আঙটা বা হুকগুলো খুলে গেল। তারপর, ধীরে ধীরে, কালো নাইলন হাত থেকে খসে পড়তে দিল। এক সময় টাইমার ও হয় হোলের মাঝখানে, চেইন লকারের ওপর, টান টান হলো রশিটা।

এখন দু'হাতই খালি, নড়তে চড়েত সুবিধে হচ্ছে। ক্রল করে টাইমারের কাছে ফিরে এল হাসান। হাতের ঘাম মুছে সবচেয়ে কঠিন কাজটায় হাত দিল এবার, একটা গ্রেনেডের পিন আংশিক খোলার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ডগা টাইমারের ট্রিপ লিভারের শেষ প্রান্তে চেপে ধরল হাসান। লিভারটাকে নামিয়ে রাখা টেপ সরাল ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে। বড় করে শ্বাস টানল, চাপ কমিয়ে আনছে অতি সতর্কতার সঙ্গে, অনুভব করল স্প্রিঙ-অপারেটেড মেকানিজম লিভারটাকে ওপরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। তারপর ওটা স্থির হলো, নাইলনের রশিতে বাধা পেয়ে নড়তে পারছে না।

বাল্কহেডে ঢলে পড়ে আটকে রাখা দম ছাড়ল হাসান। বিস্ফোরণের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। হিসেবে যদি কোথাও ভুল হয়ে না থাকে, গোল্ডামেয়ারের খোলের তলা থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে ঝুলছে গ্র্যাপনেল। পুরানো ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল্টি চার্ট দেখে রানা তাকে জানিয়েছে, সোকোট্রার কাদিব অ্যাংকারিজ-এ পানির গভীরতা একশো ফ্যাদম। তীরের দিকে যেতে, সাগরতল ক্রমশ খাড়া হয়ে আছে, সে-কারণে ডকসাইটে পানির গভীরতা তিন কি চার ফ্যাদমের বেশি নয়।

ডকে ভেড়ার অনুমতি পাবার পর গোল্ডামেয়ার আউটার অ্যাংকারিজ থেকে রওনা হবে। ডকসাইটে যখন পৌঁছুবে, গ্র্যাপনেলের আঙটাগুলো ঘষা খাবে সাগরের তলায়, লাইনে এক সময় এত টান পড়বে যে ছিঁড়ে যাবার উপক্রম করবে ওটা। ছিঁড়লে, টাইমারের ট্রিপ লিভারের ওপর থেকে সরে যাবে চাপ, ফলে ঝট করে খুলে গিয়ে সচল করে তুলবে টাইমারকে। ত্রিশ মিনিট পর, ব্যাটারি থেকে তৈরি ইলেকট্রিক কারেন্ট জ্যান্ত হবে, কর্ড-এর মাধ্যমে পৌঁছে যাবে এক নম্বর হোল্ডে সেট করা এক্সপ্লোসিভে ঢোকানো ডিটোনেটরে। ওই বিস্ফোরণ একটা চেইন রিয়্যাকশন-সূচনা ঘটাবে। অন্তত থিওরিটা এরকমই। আফসোস, ভাবল হাসান। ওর প্রিয় মাসুদ ভাইয়ের আইডিয়াটা সত্যি কাজ করে কিনা দেখার জন্যে সোকোট্রার কাদিব অ্যাংকারিজে তার উপস্থিত থাকার কোন সুযোগ নেই।

রাহমানভ হাতের শটগানটা রানার দিকে ছুঁড়ে দিল, তারপর স্লিংটা বগলের তলায় গলাল। ছোট একটা উইঞ্চ স্টার্ট নিল কপ্টারে, দ্রুত ওপরে উঠে যাচ্ছে রাহমানভ। চিনুকের দরজা দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। মইটা, স্লিং সহ, আবার নেমে আসছে। রাহমানভের আগে বাকি মার্সেনারি সবাই আগেই উঠে পড়েছে।

ফো'কাসলে উদয় হলো হাসান, ডেক ধরে রানার দিকে ছুটে আসছে। 'কাজ শেষ।' হাঁপাচ্ছে সে।

গোল্ডামেয়ারে ওরা দু'জন ছাড়া টীমের আর কেউ নেই। স্টীল-মেশ নেটিঙে জড়ানো মিসাইলটা তাকে দেখাল রানা। 'তুমি আর আমি ওটায় চড়ে রওনা হব।'

ঘামের সঙ্গে ময়লা লেগে থাকায় হাসানের গম্ভীর মুখ বীভৎস দেখাচ্ছে। মাথা নাড়ল সে। 'না, মাসুদ ভাই, এখনও আমি পাগল হইনি!'

কোন রকমে হাসি চাপল রানা। 'তোমার খুশি,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল, শটগানটা ফেলে দিল পানিতে, তারপর উঠে বসল নেটে জড়ানো মিসাইলের ওপর। হাত তুলে ফিউরিকে সঙ্কেত দিল ও, আবার তাকাল হাসানের দিকে। 'হয় আমার পাশে উঠে এসো, তা না হলে সাঁতরে সাগর পাড়ি দাও—নাকি জাহাজটার সঙ্গে সোকোট্রায় পৌঁছুতে চাও?' মিসাইলে আটকানো কেইব্‌ল্‌গুলো টান টান হতে খপ করে একটা ধরে ফেলল ও।

অকস্মাৎ দৌড় দিল হাসান, লাফ দিয়ে ধরে ফেলল স্টীল-মেশ। ইতিমধ্যে, ধীরে ধীরে, প্রকাণ্ড চিনুক ওপরে উঠতে শুরু করেছে, তারই সঙ্গে গোল্ডামেয়ারের ডেক ছাড়ছে মিসাইলটা।

হাসানকে ধরে ফেলল রানা। ওর পিছনে উঠে বসার পর চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল সে, 'এভাবে কেন?' প্রচণ্ড বাতাস লাগায় মনে হলো মিসাইল থেকে খসে সাগরে পড়ে যাবে সে।

হাসানের কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে রানা বলল, 'মিসাইলটার সঙ্গে আমাদের দু'জনের থাকা দরকার।'

'কেন?'

'মিশর থেকে যে ইয়টটা আসার কথা, সেটা সম্ভবত আসেনি।'

রানা যেন হাসানকে ঘুসি মেরেছে। স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। সাবমেরিন খুশান তোফার কমান্ডার শুধু যদি মিসাইলটা গ্রহণ করেন ওদেরকে যদি নিতে না চান, মাঝ সাগরে স্রেফ ডুবে মরতে হবে সবাইকে, এ-কথা ভেবে রানা এজেন্সির কায়রো শাখাকে একটা ইয়ট নিয়ে রনদেভোর কাছাকাছি থাকার নির্দেশ দিয়েছিল রানা। এখন ও বলছে, ইয়টটা আসেনি! আসেনি মানে? কেন আসেনি? 'আপনি জানলেন কিভাবে আসেনি? যদি আসে, সাবমেরিনের কাছাকাছি থাকার কথা ওটার, তাই না? অথচ আমরা তো এখনও জানিই না সাবমেরিনটা কোথায় রয়েছে।'

'সাবমেরিন যেখানেই থাকুক, কায়রো শাখাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম তারা যেন চিনুকের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ রাখে। চিনুকের পাইলট রানা এজেন্সির রিয়াদ শাখার হৃদয়, সঙ্গে আছে ফিউরি। ওরা কোন সঙ্কেত পায়নি। ভুলে যেয়ো না, আমাদের খোঁজে বিরাট এলাকা জুড়ে অনেকক্ষণ ধরে চক্কর দিচ্ছিল ওরা। ইয়টটা এসে থাকলে যোগাযোগ হত, দেখতেও পেত।'

খানিক পর রানার কানে চিৎকার করল হাসান, 'সেজন্যেই আমরা মিসাইলে বসে আছি? মিসাইল নিলে আমাদেরকেও যাতে নিতে বাধ্য হয়?'

'হ্যাঁ, আমাদের সবাইকে,' বলে নিচে ও পিছন দিকে তাকাল রানা।

গোল্ডামেয়ারের আলোকিত আকৃতি রাতের অন্ধকারে পিছিয়ে যাচ্ছে, দু'নম্বর হোল্ডের কাছে খালি জায়গাটা বোবা সাক্ষ্য দিচ্ছে চৌর্যবৃত্তির। ঠিক এরকমটিই

চেয়েছিল রানা।

ফিউজিলাজের কাছে খোলা দরজায় বসে রয়েছে নওশাদ। ফিউরি উইঞ্চম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে, সারাক্ষণ নজর রাখছে কেইবলের সঙ্গে ঝুলে থাকা মিসাইল আর ওটার ওপর বসে থাকা রানা ও হাসানের ওপর। পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ঘাড় ফেরাল সে।

বাখারা ইঙ্গিতে ককপিট দেখাচ্ছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল নওশাদ। পাইলট আর কো-পাইলটের জোড়া সীটের মাঝখানে ছোট একটা কালো বাক্স। বাক্সটার মাথায় প্রতি দশ সেকেন্ড পরপর একটা সবুজ আলো জ্বলছে। ওদের দিকে ফিরে হাসল পাইলট, হৃদয়। 'এটা সাবমেরিনের হোমিং বীকন। এইমাত্র লক হয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে ওটার ওপর পৌঁছে যাব আমরা।'

ঝুলন্ত মিসাইলের প্রায় চল্লিশ ফুট নিচে অকস্মাৎ উথলে উঠল গাঢ় অন্ধকার সাগর, পানির বিপুল আলোড়ন সাদা ফেনা তৈরি করল, তার ভেতর থেকে মাথাচাড়া দিল সাবমেরিন খুশান তোফার সুপারস্ট্রাকচার। হেলিকপ্টার থেকে মার্সেনারিরা হাততালি দিচ্ছে। সন্দেহ নেই কঠিন একটা মিশন শেষ করার পর উষ্ণতা, সুস্বাদু খাবার আর আরামদায়ক বিছানায় নাক ডেকে ঘুমাবার স্বপ্ন দেখছে তারা।

ব্রিজের ভেতর কন্ট্রোল রূমে রয়েছেন সাবমেরিন কমান্ডার দাউদ মাদানি, চার্ট টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একটা টু-ওয়ে রেডিওতে নির্দেশ দিচ্ছেন ফার্স্ট অফিসার খাবির রব্বানীকে। খাবির রব্বানী হ্যাচ খুলে সাবমেরিনের সমতল ফোরডেকে উঠে এলেন, হাতে রেডিও, পিছনে বাইশজন সশস্ত্র গার্ড।

কমান্ডারের নির্দেশে ফ্লাডলাইটগুলো জ্বলে উঠল, আলোর বন্যায় ভেসে গেল ফোরডেক। রেডিওতে রব্বানীকে নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি। রব্বানীর নির্দেশ পেয়ে ডেক পার্টি ব্যস্ত হয়ে উঠল বিশেষভাবে ডিজাইন করা পড খোলার কাজে। এই পড তৈরিই করা হয়েছে মিসাইলটাকে ঠাঁই দেয়ার জন্যে।

কমান্ডারের পাশে ইন-বোর্ড কমিউনিকেশন সিস্টেম জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'হেলিকপ্টার পাইলট মেসেজ পাঠিয়েছেন, স্যার। বলছেন, ওদের ফুয়েল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাই আমরা যেন দ্রুত হাত চালাই।'

'ধন্যবাদ, অপারেটর। পাইলটকে আমার অভিনন্দন জানাও। তারপর বলো, আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি। এ-ও জানাও, প্রথমে আমরা মিসাইলটা গ্রহণ করব। হেলিকপ্টারকে পানিতে নামতে হবে, কারণ মিসাইল গ্রহণ করার ফলে ওটাকে আমরা ল্যান্ড করার জায়গা দিতে পারছি না।'

জানালা দিয়ে ফোরডেকে তাকালেন কমান্ডার। পড খুলে গেছে দেখে স্বস্তি বোধ করলেন। রব্বানী দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে, হেলিকপ্টার থেকে উইঞ্চম্যান সেই নির্দেশ অনুসারে অতি সতর্কতার সঙ্গে মিসাইলটাকে ধীরে ধীরে নিচু করছে—সরাসরি পডের ওপর। ওটা মাথা সমান উঁচুতে পৌঁছুল। ডেক পার্টির ছয়জন লোক শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলল কার্গো নেটের স্টীল মেশ, তারপর ধরাধরি করে 'স্নিফার'-কে তার নতুন আস্তানায় ঢোকাল।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নেট থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে পিচ্ছিল ডেকে পা রাখল

রানা ও হাসান। ফার্স্ট অফিসার রব্বানী ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন।

ডেক পার্টির কাজ শেষ, দুই লাইনে দাঁড়াল তারা, মাঝখানে একটা প্যাসেজ তৈরি করে। সেই প্যাসেজে ঢুকে হ্যাচের দিকে হাঁটছেন রব্বানী।

মিসাইল-মুক্ত হয়েই দ্রুত আরও ওপরে উঠে গেছে চিনুক।

টু-ওয়ে রেডিওতে কমান্ডার দাউদ মাদানি নির্দেশ দিলেন। 'আমি কোন রকম রক্তপাত চাই না, রব্বানী। আমার ওপর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আছে, শুধু মিসাইলটা গ্রহণ করতে হবে। চিনুক পানিতে নামার পর আমরা ডুব দেব। স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে একটা কাজ অবশ্য করতে পারো তুমি। মিসাইলে চড়ে যে ভদ্রলোক দু'জন সাবমেরিনে নেমেছেন, ওঁদেরকে বলো—পানিতে লাফ দিন।'

হ্যাচের কাছে পৌঁছে ঘুরলেন রব্বানী। 'আপনারা পানিতে লাফ দিন, প্লীজ। সাবমেরিন ডাইভ দিতে যাচ্ছে। দুঃখিত।'

হাসানের হাতে একটা রিভলভার বেরিয়ে এল। 'মানে? এই বেঈমানীর...'

তার কাঁধে হাত রেখে চাপ দিল রানা। 'কোন লাভ নেই, জিয়া। ওরা ব্রিগেডিয়ার ফারাজির নির্দেশ পালন করছে।'

ইতিমধ্যে হ্যাচ গলে অদৃশ্য হয়ে গেছে ফার্স্ট অফিসার। তাঁর পিছু নিল ডেক পার্টি। তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল। সবার শেষে সশস্ত্র গার্ডরা হ্যাচ গলে সাবমেরিনে নামছে—প্রতিবার একজন করে, পিছু হটে।

সাবমেরিনের পোর্ট সাইডে, নব্বুই ফুট দূরে, স্থির হয়ে গেছে চিনুক। উইঞ্চ চালু করে কেইবলগুলো গুটিয়ে নিয়েছে ফিউরি, ঘাড় ফিরিয়ে মার্সেনারিদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, 'স্ট্যান্ড বাই। আমরা পানিতে নামছি। সবার লাইফ-জ্যাকেট ফুলিয়ে নাও। এখুনি!'

থমথম করছে চেহারা, ব্রিজের জানালা দিয়ে হেলিকপ্টারটাকে পানিতে ডুবতে দেখছেন কমান্ডার দাউদ মাদানি, আরোহীরা লাফ দিয়ে পানিতে পড়ছে, তাদের লাইফ-জ্যাকেটের সারভাইভাল লাইট জোনাকির মত জ্বলজ্বল করছে।

কন্ট্রোল রুমে ঢুকলেন ফার্স্ট অফিসার রব্বানী।

মাইক্রোফোনে নির্দেশ দিলেন কমান্ডার। 'অ্যাহেড হাফ।' সাবমেরিনের জোড়া প্রপেলার পানিতে আলোড়ন তুলল।

লাফ দিল রানা, পিছু নিয়ে হাসানও। সেদিকে তাকিয়ে বিষণ্ন চিত্তে মাথা নাড়লেন কমান্ডার। তারপর ফার্স্ট অফিসারের দিকে ফিরে বললেন, 'টেক হার ডাউন, প্লীজ। ফাইভ হানড্রেড ফীট।'

সাবমেরিন থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছে রানা, এই সময় ডুব দিল খুশান তোফা।

'সোনার টু ব্রিজ।'

'ফার্স্ট অফিসার। গো অ্যাহেড।'

'স্যার, সোনার-এ বিপজ্জনক কোন উপস্থিতি নেই। একজোড়া ডেস্ট্রয়ার আর তিনটে গানবোট উল্টোদিকে যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ, সোনার,' রব্বানী জবাব দিলেন। 'আমরা এখন বেসে ফিরে যাব। শুধু কেউ পিছু নিলে রিপোর্ট করবে।'

সাবমেরিন ডুব দিতে একটা ঢেউ এসে আঘাত করল সাদাতের মুখে। খক খক করে কাশতে শুরু করল সে। তার সামনে, একটু দূরে, পনিতে নিঃসাড় ভেসে রয়েছে মোস্তফা। সাঁতার দিয়ে তাড়াতাড়ি তার পাশে চলে এল সাদাত, হাত দিয়ে খামচে ধরল মোস্তফার লাইফ-জ্যাকেট। 'কি ব্যাপার?'

'আমি সাঁতার জানি না!' মোস্তফা দু'হাতে আঁকড়ে ধরল সাদাতকে।

হাত ঝাপটা দিয়ে নিজেকে ছাড়াল সাদাত। 'ছাড়ো! বাঁচতে চাইলে আমার কথা শুনতে হবে। তুমি আমাকে ধরবে না, আমি তোমাকে ধরব, ঠিক আছে? সাবমেরিন ডুব দিয়েছে, খেয়াল আছে? এখন যতক্ষণ পারা যায় ভেসে থাকতে হবে।'

'তারপর?'

'সেটা মাসুদ রানার মাথাব্যথা,' বলল সাদাত। 'নিশ্চয়ই তার জানা ছিল এ-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চয়ই কিছু করেছে!'

'রানা যদি পানি থেকে বাঁচাতেও পারে, নির্ঘাত নিউমোনিয়ায় মারা যাব আমি,' বলল মোস্তফা।

হেলিকপ্টার থেকে সবার শেষে পানিতে নেমেছে হৃদয় ও ফিউরি। ওদের সঙ্গে একজোড়া রাবার বোট রয়েছে। হাসানকে নিয়ে মার্সেনারিদের কাছে পৌঁছুতে দশ মিনিট লাগল রানার। ইতিমধ্যে ফিউরি আর হৃদয় তাদেরকে রাবার বোটে তুলতে শুরু করেছে।

'এই বোটই কি আমাদের একমাত্র সম্বল?' মোস্তফার কথায় ক্ষোভ। 'এরকম তো কথা ছিল না! সাবমেরিনটা আমাদের মাঝ সাগরে ফেলে চলে গেল কেন?'

জবাব না দিয়ে রানা নির্দেশ দিল, 'একটা রশি দিয়ে বোট দুটোকে বাঁধো, যেন আলাদা হতে না পারে। ফিউরি, রেডিওটা অন করো।'

এক নম্বর বোটে রয়েছে ফিউরি, একটা কমপার্টমেন্ট থেকে পলিথিনে মোড়া রেডিও বের করে সুইচ অন করল। কানের কাছে ধরে কিছুক্ষণ শুনল সে। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'কোন মেসেজ নেই।'

'কল করো,' নির্দেশ দিল রানা, তারপর কোডটা বলে দিল, '—পুবালি কলিং বৃশ্চিক।'

ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর একটা ডেস্ট্রয়ার রয়েছে গোল্ডামেয়ারের কাছ থেকে পনেরো মাইল দূরে। ওটার রাডার স্ক্রীনে দুটো রহস্যময় জলযান ধরা পড়ল। একটা অনেকক্ষণ ধরে স্থির হয়ে আছে। রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়েও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় ভেসেলটা মাত্র পাঁচ মাইল সামনে। ওটা শুধু রাডারেই ধরা পড়ছে, খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না। মাঝ সাগরে কোন জাহাজ স্থির হয়ে থাকলে ধরে নিতে হবে নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে। আর বিপদে পড়লে ক্যাপটেন অবশ্যই এসওএস প্রচার করবে। কিন্তু তা তো করছেই না, সিগন্যাল পাঠিয়ে কোন সাড়াও মিলছে না। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।

দ্বিতীয় ভেসেলটা ডেস্ট্রয়ারের সামনে রয়েছে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে। এটাও কোন সাড়া দিচ্ছে না। রাডার ইমেজ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওটা সম্ভবত কোন

ইয়ট। রহস্যটা হলো, একটা ইয়ট আলো নিভিয়ে রেখেছে কেন?

রাডারে দেখা গেল স্থির ভেসেলটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় ভেসেল।

ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপটেন স্পীড বাড়াবার নির্দেশ দিলেন। তিন মিনিট পর রেডিও অপারেটর জানাল, দুর্বোধ্য ভাষায় একটা কল সিগন্যাল পাচ্ছে সে, কিন্তু কোত্থেকে আসছে বুঝতে পারছে না।

ক্যাপটেন নির্দেশ দিল, 'কল সিগন্যালটা উচ্চারণ করতে পারবে?'

রেডিও অপারেটর বলল, 'ইয়েস, স্যার–পুবালি কলিং বৃশ্চিক।'

ফার্স্ট অফিসারের দিকে ফিরলেন ক্যাপটেন। ফার্স্ট অফিসার অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

'কেউ মশকরা করছে,' রাগ চেপে বললেন ক্যাপটেন। 'কান দিয়ো না।' ফার্স্ট অফিসারকে নির্দেশ দিলেন, 'স্টেশনারি ভেসেলটা ওখানে কি করছে দেখা দরকার। এঞ্জিন রূমকে বলো ফুলস্পীড চাই আমি।'

সকাল হতে তখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি, গোল্ডামেয়ারের পাশে এসে থামল ডেস্ট্রয়ার। মেরিনদের বোর্ডিং পার্টি ডেস্ট্রয়ার-ক্যাপটেনকে রিপোর্ট করল, গোল্ডামেয়ার ইসরায়েলি জাহাজ, গন্তব্য ছিল সোকোট্রা ন্যাভাল বেস, বহন করছিল বারোটা মিসাইল, তার মধ্যে একটা হাইজ্যাক হয়ে গেছে, ক্যাপটেন ও ক্রুরা বন্দী, যদিও হাইজ্যাকাররা কেউ জাহাজে নেই...

রিপোর্ট পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত দিলেন ডেস্ট্রয়ার ক্যাপটেন, 'গোল্ডামেয়ারের ক্যাপটেনকে গ্রেফতার করো।' এটাই প্রচলিত নিয়ম, কোন অঘটন বা অপরাধ সংগঠিত হলে নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি গিল্টি। আপাতত শুধু গ্রেফতারই করা হলো, বেন দাইয়ানকে পরে ইন্টারোগেট করবে মোসাড এজেন্টরা।

গোল্ডামেয়ারের দায়িত্ব দেয়া হলো ডেস্ট্রয়ারের ফার্স্ট অফিসারকে। রেডিও সিগন্যাল পাঠানো হলো সোকোট্রায়, একজোড়া টাগ এসে যেন গোল্ডামেয়ারকে টো করে নিয়ে যায় ন্যাভাল বেসে। একটা স্ট্রেচার পাঠানো হলো, বেন দাইয়ানের আহত স্ত্রীকে ডেস্ট্রয়ারের হসপিটালে নিয়ে আসবে।

উল্লাসে ফেটে পড়ল ফিউরি। 'মাসুদ ভাই! সাড়া পেয়েছি!'

'কোডেড?' জানতে চাইল রানা, হাসানের পাশে দ্বিতীয় রাবার বোটে রয়েছে ও।

'না! শুধু শুনতে পেলাম–আসছি!'

'বাংলায়?'

'জ্বী, মাসুদ ভাই!'

'তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের ইয়টই সাড়া দিয়েছে,' বলল হাসান।

'রিয়াদ শাখার মাহমুদ আর শক্তির থাকার কথা ওটায়,' বলল রানা।

ওর কানে ফিসফিস করল হাসান, 'আসছি বলার মানে কি? কত দূরে ওটা? আমরা কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

রানাও চিন্তিত। দিগন্তে চোখ বোলাচ্ছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

হাসান আবার ফিসফিস করল, 'ইসরায়েলিরা ইয়টের পিছু নেয়নি তো?' একটা ঢোক গিলল সে। 'কোন গানবোট বা ডেস্ট্রয়ার?'

রানা উত্তরে কিছু বলল না। এক মুহূর্ত পর সাদাতের সামনে একটা হাত পাতল। 'টর্চটা দাও।' সেটা হাতে পাবার পর ফিউরিকে কম্পাস বের করতে বলল। 'গোল্ডামেয়ারকে আমরা কোনদিকে ফেলে এসেছি?'

'সোকাট্রা থেকে সত্তর মাইল দূরে গোল্ডামেয়ার–,' শুরু করল ফিউরি।

এক মুহূর্ত পর টর্চ জ্বেলে পশ্চিম দিকে সঙ্কেত দিল রানা–একটা দীর্ঘ, একটা সংক্ষিপ্ত, একটা দীর্ঘ। এক মিনিট বিরতি নেয়ার পর রিপিট করল। এভাবে কয়েকবার।

'ফিউরি, রেডিওতে কিছু পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

চুপসে গেছে ফিউরি। 'নাহ্।'

হাসান গলা চড়িয়ে বলল, 'শুনতে তোমার ভুল হয়নি তো?'

ফিউরির গলায় অনিশ্চিত সুর, 'কি জানি...'

আবার টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিল রানা। এবার থামতেই অন্ধকার থেকে সাড়া পাওয়া গেল। তবে টর্চ নয়, ওদের কানা করে দিল একটা সার্চলাইট।

ঝট করে হাত তুলে চোখ ঢাকল সবাই। আলোর বন্যা আছড়ে পড়েছে সরাসরি জোড়া রাবার বোটের ওপর। মিনিট কয়েক পর একটা বুলহর্ন জ্যান্ত হয়ে উঠল, 'বৃশ্চিক কলিং পুবালি। মাসুদ ভাই, আমি মাহবুব, ইয়ট রাজহংস থেকে বলছি। কল অ্যাকনলেজ করার প্রয়োজন নেই, মাসুদ ভাই। আমরা আপনাদের দেখতে পাচ্ছি। রেডিও অফ করে দিন–রিপিট করছি–রেডিও অফ করে দিন, প্লীজ! আমরা বোট নামাচ্ছি।'

সোকোট্রায় ইসরায়েলের কম্বাইন্ড সার্ভিসেস এস্টাব্লিশমেন্ট বাদামী রঙের চারতলা একটা-কংক্রিট কাঠামো, কাদিব বন্দরের কিনারা থেকে নয়শো গজ পিছনে। তিনতলার ইন্টারোগেশন রুমের প্রতিটি জানালায় লোহার গরাদ লাগানো আছে, তারই একটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অর্ধবৃত্ত আকৃতির অ্যাংকারিজ ও হারবারের বিশাল বিস্তৃতির ওপর চোখ বোলাচ্ছেন বেন দাইয়ান। বন্দরে নোঙর ফেলা জাহাজগুলোর আলো অন্ধকার আকাশের গায়ে নক্ষত্রের মত ফুটে আছে। অ্যাংকারিজের কোথাও, ওগুলোর ভিড়ে, ডেস্ট্রয়ারটাও আছে, যেটায় তুলে এখানে তাঁকে আনা হয়েছে এক ঘণ্টা আগে। দু'জন মেরিন গার্ড যুদ্ধজাহাজ থেকে এখানে নিয়ে আসে তাঁকে, তারপর আর কারও দেখা নেই।

তাঁর স্ত্রীকেও একই সময় ডেস্ট্রয়ার থেকে নামিয়ে মিলিটারি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হসপিটালটা রাস্তার আরেকটু দূরে। এক জোড়া টাগ অচল গোল্ডামেয়ারকে নিয়ে সেকোট্রার উদ্দেশে রওনা হয় সকাল আটটায়। কাছাকাছি কোথাও ছিল ওগুলো, রেডিও মেসেজ পেয়ে গোল্ডামেয়ারের কাছে পৌঁছুতে বেশি সময় নেয়নি। এখন রাত ন'টা। ডেস্ট্রয়ার আর টাগ প্রায় একই সময়ে রওনা হলেও, ন্যাভাল বেসে গোল্ডামেয়ারের পৌঁছতে আরও সময় লাগবে। তিনি গ্রেফতার হবার পর স্ত্রীকে একবারও দেখার সুযোগ পাননি, যোগাযোগ করার

অনুমতিও দেয়া হয়নি। এটাকে স্রেফ অকারণ নিষ্ঠুরতাই বলতে হবে। তবে ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার হিসেবে বাধ্য হয়ে এ-সব মেনে নিতে হচ্ছে তাঁকে। পরিস্থিতির ব্যাখ্যা যেভাবেই দেয়া হোক, তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, অজ্ঞাতনামা রাষ্ট্রীয় শত্রুকে চুরি করতে দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ একটা সামরিক ইকুইপমেন্ট। এ-ধরনের ব্যর্থতার শাস্তি এমন ভয়াবহ, কল্পনা করতে সাহসে কুলায় না। কিন্তু শাস্তি তো সর্বশেষ ফলাফল, তার আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যে ইন্টারোগেশন চলবে, সেটা শেষ হবার আগে তিনি না পাগল হয়ে যান।

একটা চুরুট ধরিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। দিনের বেলা হারবার আর ওটাকে ঘিরে থাকা আশপাশের বিল্ডিংগুলোকে কদর্য আর নোংরা লাগে, কর্কশ ধাতব শব্দলাঞ্ছিত পরিবেশে কান পাতা দায় হয়ে ওঠে। তবে রাতে গোটা এলাকা নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে, আলোকমালায় সজ্জিত সুন্দর একটা দৃশ্য তৈরি হয়। তাঁর বাম দিকে চাঁদের আলোয় রূপোর মত চকচক করছে অয়েল স্টোরেজ ট্যাংকের বিশাল কমপ্লেক্স। ওয়্যারহাউস আর ক্রেনগুলোর তীক্ষ্ণ কোণ আর বাঁক অস্পষ্ট, ফলে চোখের জন্যে পীড়াদায়ক লাগছে না। অ্যাংকারিজের বাইরে নয় হাজার টনী একটা ক্রুজার রাজকীয় ভঙ্গিতে বয়ার সঙ্গে ভাসছে, ছুরির মত ধারাল বো থেকে আকাশ ছোঁয়া চিমনি পর্যন্ত ঝলমল করছে আলোয়। ওটার চারপাশে ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর অন্যান্য ইউনিট ভিড় করে আছে—সাত-আটটা ডেস্ট্রয়ার, পাঁচ-সাতটা ফ্রিগেট, দু'জোড়া করভেট, দুটো মাইনসুইপার, কয়েকটা টর্পেডো বোট ও একটা সাবমেরিন সাপোর্ট শিপ।

প্রায় সব ভেসেলই তাঁর চেনা, ওগুলোর অনেক অফিসারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব আছে। নিজে তিনি গুরুতর একটা বিপদে জড়িয়ে পড়লেও, ইসরায়েলি নৌ সমরশক্তির এই সব উপকরণ দেখে গর্ব অনুভব করলেন। যদিও দেহ-মন জুড়ে রয়েছে একটা আক্রোশ ও ঘৃণা। এ আক্রোশ আর ঘৃণা অজ্ঞাতপরিচয় এক শত্রুর প্রতি, যে তার ক্যারিয়ার, এবং সম্ভবত জীবনটাও, ধ্বংস করে দিয়েছে। লোকটাকে নিয়ে তাঁর দ্বন্দ্ব এখনও দূর হয়নি। যতই ঘৃণা করুন আর আক্রোশ হোক, মার্সেনারিদের লীডারকে সাধারণ কোন মানুষ বলে মনে হয়নি তাঁর। পরিচয় যাই হোক, লোকটা তাঁকে বোকা বানিয়েছে যোগ্যতার গুণে। হিব্রু ভাষায় অনর্গল কথা বলে তাঁকে সে মুগ্ধ করে ফেলে। তেল আবিবের সমস্ত খবর তার মুখস্থ ছিল। ইচ্ছা করলেই তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু তা মারেনি। তাঁর স্ত্রী বোকামি করায় আহত হলো, ইচ্ছা করলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলেও পারত। আর শুধু কি চিকিৎসা, গ্রুপ মিলে যাওয়ায় বিনা দ্বিধায় রক্তও তো দিল!

আবার সেই লোকই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে বিনা দ্বিধায় গুলি করে মারল সুলেরিকে।

না। এই লোক সাধারণ কেউ নয়।

লোকগুলো মার্সেনারি ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কে তাদেরকে ভাড়া করে, কোত্থেকে তারা এল, এ-সব প্রশ্নের জবাব হয়তো কোনদিনই জানা যাবে না। এগুলোর চেয়েও বড় প্রশ্ন হওয়া উচিত—এডেনের সব রকম বাধা-বিঘ্ন

পেরিয়ে, হাই সিকিউরিটি টপকে তাঁর জাহাজে তারা উঠল কিভাবে? এই প্রশ্নকে ঘিরেই আবর্তিত হবে ইন্টারোগেশন। তাকে আসলে কোনভাবেই দায়ী করা যায় না। কিন্তু তাঁর যুক্তি কেউ কানে তুলবে না, তিনি জানেন। কাউকে দায়ী করার জন্যে নাগালের মধ্যে একজনকে দরকার ইসরায়েলের। থাকার মধ্যে একা তিনিই আছেন।

তাঁর পিছনে দরজা খোলার আওয়াজ হলো। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। মোসাড-এর একজন কর্নেল ঢুকলেন ভেতরে। খালি একটা কাঠের টেবিলের পিছনে স্টীল চেয়ারে বসলেন। মোসাডের কয়েকজন গার্ড পাহারায় থাকল দরজার দু'পাশে। টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন কর্নেল। 'বসুন!' কর্কশ ধমকের সুর।

বেন দাইয়ান উপলব্ধি করলেন, তাঁর নরকযন্ত্রণা শুরু হলো।

দু'দফায় বারো ঘণ্টা মড়ার মত ঘুমিয়ে রাজহংসের একটা কেবিনে চোখ মেলল রানা। কেবিনের মেঝে, দেয়াল, সিলিং থেকে শুরু করে বিছানা, চাদর, পর্দা সবই দুধসাদা। ধীরে ধীরে মনে পড়ে গেল কোথায় রয়েছে ও। বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা রোলেক্সের ওপর চোখ বুলাল। শিরিনের কথা মনে পড়ে যেতে ক্ষীণ হলেও এক ধরনের বিষণ্নতা জাগল মনে। এখন থেকে প্রায় ষোলো ঘণ্টা আগে ওদেরকে উদ্ধার করে বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হয় রাজহংস। এখন বাজে সন্ধে সাতটা। দুপুরে লাঞ্চ খাবার সময়ই মার্সেনারিরা ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হেলিকপ্টারে ওঠে, পাইলট তাদেরকে পৌঁছে দেবে শ্রীলংকায়, ওখান থেকে চার্টার করা প্লেন নিয়ে আমস্টারডামে চলে যাবে সবাই। নুওশাদকে একটা চিঠি দিয়েছে রানা, নেগাই মেনেমকে লেখা, সেটা দেখালেই মার্সেনারিরা তাদের প্রাপ্য বাকি টাকা পেয়ে যাবে। ইয়টের চেয়ে হেলিকপ্টারের স্পীড অনেক অনেক বেশি, এতক্ষণে নিশ্চয়ই কান্ডিতে পৌঁছে গেছে তারা। আরোহীদের নামিয়ে দিয়ে যান্ত্রিক ফড়িংটা ফিরে আসবে রাজহংসে। আরেকবার ঘড়িটার ওপর চোখ বোলাল। ভারতের ত্রিবান্দ্রাম আর শ্রীলংকার কান্ডিকে দু'পাশে রেখে বঙ্গোপসাগরে ঢুকবে রাজহংস, তবে তা সকালের আগে সম্ভব বলে মনে হয় না।

ওরা ইয়টে ওঠার পরপরই রানা এজেন্সির রিয়াদ শাখার প্রধান মাহবুব সবাইকে নিয়ে মেইন সেলুনে ঢোকে, ক্রুরা ওদের প্রত্যেকের জন্যে শুকনো কাপড়চোপড় আর গরম কফি নিয়ে অপেক্ষা করছিল ওখানে। পানিতে বেশ কিছুক্ষণ থাকতে হয়েছিল, তাছাড়া এডেন থেকে-গোল্ডামেয়ার রওনা হবার পর কেউই তেমন বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পায়নি, ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করার পর ক্রুরা সবাইকে যার যার কেবিনে পৌঁছে দেয়।

মেইন সেলুন থেকে সবার শেষে বেরোয় রানা ও হাসান। রাজহংসের রহস্যময় আচরণের ব্যাখ্যাটা তখনই পায় ওরা। মাহবুব জানায়, ঠিক সময়েই কায়রো থেকে রওনা হয়েছিল তারা, কো-অর্ডিনেটস ফলো করে লিবীয়ান সাবমেরিন আর চিনুক হেলিকপ্টারের রনদেভোয় পৌঁছুতে কোন সমস্যায় পড়তে হবে বলে ভাবেনি সে। কিন্তু বাদ সাধল ইসরায়েলি একটা ডেস্ট্রয়ার। রাজহংস

সোকোট্রাকে ছাড়িয়ে আসার পরপরই পিছু নেয় ওটা। শুধু নেভিগেশনাল লাইট জ্বেলে সাগর পাড়ি দিচ্ছিল ওরা, কিন্তু ডেস্ট্রয়ারের রাডারে ইয়টের অস্তিত্ব ধরা পড়ে যায়। ডেস্ট্রয়ার থেকে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়–কি ধরনের জাহাজ, কোন দেশের, কোত্থেকে আসছে, যাবেই বা কোথায় ইত্যাদি জানতে চায় ডেস্ট্রয়ারের রেডিও অপারেটর। রাজহংস রেডিও সাইলেন্স বজায় রাখে, একবারও সাড়া দেয়নি। ফিউরির কোডেড মেসেজ ঠিকই ওরা শুনতে পায়, কিন্তু ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে ভেবে সাড়া দেয়নি।

বিছানায় বসে পায়ে স্যান্ডেল ঢোকাচ্ছে রানা, ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। চমকে উঠে মুখ তুলতেই দেখল কেবিনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শিরিন। মুখ হাঁ হয়ে যাচ্ছিল, কোন রকমে নিয়ন্ত্রণ করল রানা। 'তুমি? তোমার না ওদের সঙ্গে হেলিকপ্টারে থাকার কথা?'

চোখের সামনে থেকে ক্যামেরাটা নামিয়ে মিষ্টি করে হাসল শিরিন। 'শ্রীলংকাতেই যাব, তবে ওদের সঙ্গে নয়। ওরা আন্তর্জাতিক মার্সেনারি।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'ওদেরকে আমি যে কাগজ-পত্র দিয়েছি তাতে বলা হয়েছে ওরা ট্যুরিস্ট, বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছে। তুমি বলতে চাইছ ওদের কাভার ফাঁস হয়ে যাবে?'

'না, তা হয়তো যাবে না। হলেও, তেমন কোন ক্ষতি নেই। কারণ শ্রীলংকায় যাচ্ছেই ওরা সরকারী বাহিনীতে কাজ করার চুক্তি নিয়ে। ওরা আন্তর্জাতিক মার্সেনারি, তাই আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাইনি।'

রানার কাছে ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না। 'কিন্তু মার্সেনারি তো তুমিও!'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার কাভার একটাই, সেটা কখনোই বদল করি না–ফ্রী ল্যান্সার ফটোগ্রাফার অ্যান্ড জার্নালিস্ট। কান্ডিতে ওদেরকে কেউ যদি চিনে ফেলে, আর ওদের সঙ্গে যদি আমিও থাকি, আমার কাভারটা নষ্ট হয়ে যাবে না?'

'আচ্ছা, বুঝলাম। কিন্তু তাহলে আবার শ্রীলংকায় যেতে চাইছ কেন?'

'কাভারটাকে আরও পোক্ত করার জন্যে,' বলল শিরিন। 'তামিল টাইগারদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে সরকারী বাহিনীর, জানেনই তো। শুধু ইসরায়েল, প্যালেস্টাইন আর জর্দানে কাজ করি, লোকের এই ধারণাটা এবার ভাঙতে চাই। শ্রীলংকার এই যুদ্ধটা একেবারে ফ্রন্টলাইন থেকে কাভার করব আমি।'

রানাকে একটু চিন্তিত দেখাল। 'কিন্তু শ্রীলংকায় তুমি যাচ্ছ কিভাবে? ইয়ট তো কোথাও থামবে না, সরাসরি চট্টগ্রামে যাচ্ছি আমরা।'

'কতদিনের পরিচয়, এ-ও জানেন আপনার আমি কি সাংঘাতিক ভক্ত, কিন্তু কই–একদিনও তো বললেন না বাংলাদেশে বেড়াতে এসো!' শিরিনের গলায় খানিকটা অভিমান। 'মাহবুব ভাইকে আমার এই দুঃখের কথা বলতেই তিনি আপনার হয়ে আমন্ত্রণ জানালেন, আমিও রাজি হয়ে গেলাম।' হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল চোখ দুটো। 'আপনি কিছু মনে করছেন না তো?'

হেসে উঠল রানা। 'আরে না, সত্যি আমার ভাল লাগছে। কিন্তু আমার তরফ থেকে কেন, মাহবুব নিজের তরফ থেকেই তোমাকে বাংলাদেশ দেখার আমন্ত্রণ

জানাতে পারত।'

'মাহবুব ভাই বললেন, তাঁর নাকি ছুটি পাবার উপায় নেই, ঢাকা হয়ে দু'একদিনের মধ্যেই রিয়াদে ফিরে যেতে হবে,' বলল শিরিন। 'তাই আমাকে বাংলাদেশ দেখাবার দায়িত্বটা তিনি কৌশলে আপনার ঘাড়েই চাপাতে চাইলেন আর কি।'

বারণ করা সত্ত্বেও রানার মন খুশি হয়ে উঠল। এর জন্যে দায়ী শিরিনের সান্নিধ্য পাবার লোভ। মনের ভেতর তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। শিরিন একটা ছেলেকে ভালবাসে তো কি হয়েছে, ছুটির ক'টা দিন ওকে নিয়ে সৈকতে বেড়ালে কারও তো ক্ষতি নেই। শুধু হ্যাঁ, সম্পর্কের মাধুর্যটুকু, অর্থাৎ পবিত্রতা অটুট রাখতে পারলেই হলো। হেসে উঠে বাথরুমের দিকে এগোল ও, বলল, 'ঠিক আছে, ফিরে এসে বলছি সুন্দরবনে কবে তোমাকে নিয়ে যেতে পারব...'

আনন্দ আর বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল শিরিন, 'সুন্দরবন...সত্যি বলছেন? ওহ্ গড!'

একজোড়া শক্তিশালী নেভী টাগ গোল্ডামেয়ারকে সোকোট্রা হারবারে টেনে নিয়ে আসছে, ওটার পোর্ট উইঙে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফার্স্ট অফিসার তারেক আজাম। হেড ও স্টার্নে নেভী পার্সোনেলরা অপেক্ষা করছে, হারবার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লোকজন লাইন ছুঁড়ে দিল ধরার জন্যে। তীরে ছোট একটা ভিড় দেখতে পাচ্ছে সে, কয়েকজনের পরনে ইউনিফর্ম, অপেক্ষা করছে একটা শেডের ভেতর, পাশেই আকাশ ছুঁয়ে আছে একটা ক্রেইন। ওখানে ওরা কেন দাঁড়িয়ে আছে, তারেক আজামের বুঝতে অসুবিধে হলো না। জাহাজটাকে বাঁধার কাজ শেষ হলেই তাকে সহ ক্রুদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তীরে নামানো হবে। সময়টা দুপুর, প্রচণ্ড রোদ, তা সত্ত্বেও ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল তার।

মনটাকে শান্ত করার জন্যে এদিক থেকে চোখ সরিয়ে আনল আজাম। পিছন দিকে, লম্বা জেটির শেষ প্রান্তে, এক হাজার টনী একটা অয়েল ট্যাংকার পাইপলাইন নেটওঅর্কে কার্গো খালাস করছে, লাইনগুলো কয়েকবার দিক বদলে পৌঁছেছে অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক কমপ্লেক্সে। সামনে, পরবর্তী বার্থ-এ, ভাসছে প্রকাণ্ড একটা কন্টেইনার শিপ। ওটার ফোরমাস্টে নেতিয়ে পড়েছে লাল একটা ডেঞ্জার ফ্ল্যাগ—এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল সিগন্যাল, এক্সপ্লোসিভ খালাস করা হবে। তিক্ত হাসি ফুটল আজামের ঠোঁটে। দেশ থেকে দূরে হওয়ায় সোকোট্রা ন্যাভাল বেসে নিরাপত্তার অবশ্য পালনীয় নিয়ম ও আইন ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর প্রশাসনিক কর্মকর্তারা মেনে চলেন না বলে কুখ্যাতি আছে। এখানে অন্তত একজন ক্যাপটেনকে ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে।

চোখ তুলে দূরে, অ্যাংকারিজের দিকে তাকাল আজাম। বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে ক্রুজার ভেসেলগুলো। হঠাৎ খুব ক্লান্ত বোধ করল সে। গালফ অভ এডেন থেকে দীর্ঘ ও মন্থরগতি টো-র ধকলই সেজন্যে দায়ী, কপালে কি আছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তাও কম দায়ী নয়। টো শুরু হবার পর থেকে মাত্র দু'বার ব্রিজ থেকে বেরিয়েছে সে, দ্বিতীয়বার বেরিয়েছিল নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে

ব্যাগে ভরার জন্যে। সেটা এখন পড়ে আছে ক্যাপটেনের কেবিনে।

কাঠের কীসাইডে ধাক্কা খেলো জাহাজ, সামান্য ঝাঁকি লাগল। ক্রেইনের পাশে দাঁড়ানো লোকগুলো সামনে বাড়ল। একটা গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক বসানো হলো পজিশনে। শিকারী কুকুরের মত মনে হলো লোকগুলোকে, তর সইছে না, ক্রুদের জেরায় জেরায় জেরবার করার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। ঘুরল সে, ফিরে এল ব্রিজে।

গোল্ডামেয়ারের গভীরে, চেইন লকারে, জিয়া হাসানের হাতের কাজ ভয়ঙ্কর একটা ফল প্রসব করতে যাচ্ছে।

উনত্রিশ মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ড আগে গ্র্যাপনেলটা ধাপবহুল সাগরতলে আটকে যায়। সেই থেকে শুরু হয়েছে অপরিবর্তনীয় ঘটনা পরম্পরা। নয়…আট…সাত…ছয়…টাইমার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাল, বিরতিহীন টিকটিক করে মুহূর্ত গুণছে। নরম 'ক্লিক'-এর সঙ্গে শেষ মেসেজ পাঠাল ওটা।

ইলেকট্রিক পালস কর্ড ধরে পৌঁছে গেল ডিটোনেটরে, সেটা বিস্ফোরকের ভেতরে ঘুমিয়ে আছে, আর বিস্ফোরক বাঁধা আছে এক নম্বর হোল্ডে রাখা ওঅরহেডে। মাইক্রো সেকেন্ড পর, বিস্ফোরিত হলো নরক, মুহূর্তে অস্তিত্ব হারাল গোল্ডামেয়ার।

হোল্ডগুলোয় ভাগে ভাগে বিপুল বিধ্বংসী শক্তি মউজুদ ছিল, একত্রে সবগুলো মহা একটা বিস্ফোরণ ঘটাল; শুধু ওপর দিকে নয়, চারদিকে ছুটল বিশাল আকারের অগ্নিগোলক। পাশের সচল প্রকাণ্ড ক্রেইনটা রেইল থেকে উৎপাটিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হলো একশো ফুট দূরে, ডকসাইটকে ছাড়িয়ে বহুতল একটা ওয়্যারহাউসে গিয়ে পড়ল। জ্বলন্ত আবর্জনা ভয়াবহ অগ্নিবৃষ্টির রূপ ধারণ করল। মাত্র এক সেকেন্ড পার হয়েছে, প্রথমটার চেয়েও বিপুল শক্তিতে বিস্ফোরিত হলো পরবর্তী বার্থের কন্টেইনার শিপ, যেন মহাশূন্যের উদ্দেশে রওনা হয়ে একটা বিশাল রকেটে আগুন ধরে গেছে।

পাইপলাইন আর ট্যাংকারকে সংযুক্ত করা কাপলিং ছিঁড়ে গেল, আগুন ধরল ফুয়েলে, পাইপ ধরে কমলার সঙ্গে নীল মেশানো শিখা ছুটল স্টোরেজ ট্যাংকের দিকে। ট্যাংকারের হোল্ড হাইড্রোকার্বন গ্যাসে অর্ধেক ভর্তি, শিখার স্পর্শ পেয়ে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল, আওয়াজ শুনে মনে হলো একসঙ্গে পঞ্চাশটা কামান দাগা হয়েছে।

গোল্ডামেয়ারের স্টার্ন সেকশনটাকে যেন এক দৈত্যের হাত সাগর থেকে তুলে নিল, অ্যাংকারিজের ওপর দিয়ে উড়িয়ে এনে ছেড়ে দিল ক্রুজারের ওপর, সেটার পুরো ডেক সিস্টেমে ছড়িয়ে দিল জ্বলন্ত ফুয়েল। যুদ্ধজাহাজটার ডজনখানেক কমপার্টমেন্টে অকস্মাৎ লাফ দিয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠল আগুন। কয়েকশো লোক যেখানে যে অবস্থায় ছিল তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত মশালে পরিণত হলো। দুটো ফরওয়ার্ড ম্যাগাজিন বিস্ফোরিত হওয়ায় আর্মার প্লেটের কাস্তে আকৃতির বিশাল সব টুকরো অ্যাংকারিজের ওপর দিয়ে ছুটল। জ্বলন্ত তেল দ্রুতগতি স্রোত হয়ে বেরিয়ে আসছে ভাঙা কমপার্টমেন্ট থেকে, টকটকে লাল লাভার মত ছড়িয়ে পড়ছে বেতে, পথে অসহায় জাহাজগুলোকে পেয়ে আগুন লাগাবার উৎসবে মেতে

উঠেছে।

তীরে প্রথমে একটা স্টোরেজ ট্যাংক ফাটল, তারপর দ্রুত একের পর এক বিস্ফোরিত হলো আরও এগারোটা। তরল আগুনের স্তম্ভ খাড়াভাবে কয়েকশো ফুট ওপরে উঠল, তারপর বৃষ্টির মত ছড়িয়ে পড়ল নিচে, গোটা এলাকা ঢেকে দিল আগুনের নিশ্ছিদ্র পর্দা। দশ সেকেন্ডের মধ্যে অ্যাটমসফিয়ার থেকে সমস্ত অক্সিজেন শুষে নেয়া হয়েছে, ফলে সৃষ্টি হলো অভূতপূর্ব একটা অগ্নিঝড়। এই অগ্নিঝড় কোন বিরতি বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই একটানা কয়েক দিন ধরে চলতে থাকবে, যতক্ষণ পোড়ার মত আর কিছু না থাকে।

ক্যাপটেন বেন দাইয়ানের স্ত্রী মারা গেলেন অপারেটিং টেবিলে। হসপিটাল ভবন উড়ে যাওয়ায় উপস্থিত কেউই রক্ষা পায়নি। তাঁর স্বামী দু'সেকেন্ড বেশি বাঁচলেন। ইন্টারোগেশন রূম সহস্র টুকরোর আবর্জনায় পরিণত হলো, তাঁর বুক আর মাথা চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল। মোসাড এজেন্টরাও কেউ বাঁচল না।

সৈন্যদের ব্যারাকে লাগা আগুনটা এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, লাশের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। কাদিব-এর শেষ প্রান্তে বড়সড় অ্যামিউনিশন ডিপোও রক্ষা পায়নি। লোকজন প্রাণ হাতে করে ছুটলেও, কেউ তারা রেহাই পেল না, আগুন চারদিক থেকে ধাওয়া করে শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলল সবাইকে।

বাঁচল শুধু কয়েকজন লোকের ছোট্ট একটা দল। শারীরিকভাবে রক্ষা পেলেও, এই নারকীয় ঘটনার কথা সারাজীবন মনে থাকবে তাদের, মানসিকভাবে কোনদিনই পুরোপুরি সুস্থ বোধ করবে না। ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর একটা এসকর্ট ওঅরশিপ–করভেট। অ্যাংকারিজের বাইরে সিকিউরিটি পেট্রলে ছিল ওটা। বিস্ফোরণ, তারপর বিস্ফোরণজনিত অগ্নিঝড় অসহায় দর্শক হয়ে চাক্ষুষ করল তারা। তরুণ লেফটেন্যান্ট বারবার চেষ্টা করল অ্যাংকারিজে পৌঁছাতে, কিন্তু আগুনের পাঁচিল আর চামড়ায় ফোস্কা পড়া আঁচ বারবার পিছিয়ে আসতে বাধ্য করল তাকে। শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ল সে, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল ব্রিজে। দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট সাগরের দিকে ঘুরিয়ে নিল করভেটকে, রেডিও অপারেটর দিশেহারা উন্মাদের মত সাহায্য চেয়ে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে।

রেইলিং ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুরা, বিস্ফারিত চোখে দেখছে আকাশের এক হাজার ফুট ওপরে টগবগ করে ফুটছে তেল চকচকে কালো ধোঁয়ার বিশাল সব স্তম্ভ, পুরোপুরি ঢেকে ফেলছে সূর্যটাকে, ফলে দিনের বেলা গোটা এলাকায় রাত্রি নেমে এসেছে। বাতাসে ভর করে উড়ে আসা ছাই ঢেকে ফেলছে করভেটের ডেক।

সোকোট্রা দ্বীপে ইসরায়েলের ন্যাভাল বেস নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে, মোসাড অন্তত উপলব্ধি করতে পারবে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে মাসুদ রানার প্রতিশোধ।